শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রার্থনা

জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ
জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
জ্বলন্তং সর্বতো মুখম্ ।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্ ।।
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্ম ভৃঙ্গ।।

অনুবাদক ও প্রকাশক ঃ অদ্বৈত আচার্য দাস ব্রহ্মচারী
ইস্কন, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
পিন ঃ৭৪১৩১৩
ই-মেল ঃ [illegible]

সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী, ২০০৭, ৫০০০ কপি

এই পুস্তিকা মুদ্রণের জন্য আনুকূল্য করেছেন
ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা ধন্য—

- শ্রী অদ্বৈত আচার্য দাস
- শ্রী রাধাকান্ত দাসাধিকারী
- শ্রী ঈশ্বর কৃষ্ণ দাসাধিকারী

মুদ্রণ ঃ-শ্রীকৃষ্ণ প্রেস এন্ড ডি.টি.পি. সেন্টার
বল্লালদিঘী, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, [illegible]

শ্রীশ্রীনৃসিংহ অবতার

'হরেকৃষ্ণ টুডে' পত্রিকায় নৃসিংহ অবতার সম্পর্কে শ্রীঅর্জুন দাস একটি নিবন্ধ লিখেছেন। তার বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

শ্রীবিষ্ণুর প্রধান দশ অবতারের মধ্যে চতুর্থ অবতার হলেন শ্রীনৃসিংহদেব। শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা মহর্ষি পরাশর তাঁর ''হোরা শাস্ত্রে'' শ্রী নৃসিংহদেবকে পরমেশ্বর ভগবানের চারটি স্বরূপের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীনৃসিংহদেব হচ্ছেন পুরোপুরি পরমাত্মাংশ এবং ভগবানের অপরাপর প্রকাশের অন্যতম।

শ্রীমদ্ ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে পরমেশ্বর ভগবান নৃসিংহদেবের বিস্ময়কর আবির্ভাব এবং মহিমার বর্ণনা রয়েছে।

বহুদিন পূর্বে হিরণ্যকশিপু নামে এক মহাশক্তিশালী দৈত্য ছিল। সে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রসহ অপরাপর দেবতাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে। হিরণ্যকশিপু নিজের অমরত্ব লাভের জন্য এক সময় কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত হয়। নিজের দুই হাত উর্দ্ধে তুলে নিরবচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে সে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছ থকে অমরত্ব লাভের বর পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন কৃচ্ছতা অবলম্বন করে। এভাবে বহু বছর অতিক্রান্ত হয়। এক সময় হিরণ্যকশিপুর মাথার উপরিভাগ থেকে আগুন এবং ধোঁয়া বের হতে থাকে। ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব প্রাণীর জীবন সংশয় হয়ে পড়ে। তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বলেন যে তিনি (ব্রহ্মা) নিজেও অমর নন। তাই তিনি কি করে তাকে অমর বর দিতে পারেন? হিরণ্যকশিপুকে তখন এই প্রতিশ্রুতি (বর) দেওয়া হয় যে, সে কোন অস্ত্র, দৈত্য-দানব, দেবতা, মনুষ্য, পশু ইত্যাদি দ্বারা নিহত হবে না। এমনকি সে বহির্দ্বার বা অন্তর্দ্বারে এবং দিনে বা রাতে নিহত হবে না।

হিরণ্যকশিপু যখন ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভের জন্য রাজ্য ত্যাগ করে কৃচ্ছ সাধনে নিয়োজিত হয়, সেই সময় ইন্দ্র তার অন্তসত্ত্বা (গর্ভবতী) স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য ছিল তার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করা। কারণ ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতারা মনে করেছিলেন, এই গর্ভস্থ সন্তানও হিরণ্যকশিপুর মতোই একজন মহাশক্তিশালী দানব হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ইন্দ্র গর্ভস্থ সন্তান বিনাশ করার লক্ষ্যে হিরণ্যকশিপুর স্ত্রীকে হরণ করেছিলেন। কিন্তু দেবর্ষি নারদ দেবতাদের এই কাজে নিবৃত্ত করেন। তিনি হিরণ্যকশিপুর স্ত্রীকে হিমালয় পর্বতে অবস্থিত তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান। তিনি সেখানে এই রমণী এবং তার গর্ভস্থ সন্তানকে পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কিত সর্বোত্তম জ্ঞান এবং উত্তম সেবা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ

প্রদান করেন। হিরণ্যকশিপু তপস্যা থেকে ফিরে এসে যখন দেবতাদের ওপর পুনরায় আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তার কাছে নারদ মুনি স্ত্রী এবং পুত্র প্রহ্লাদকে ফিরিয়ে দেন।

অল্প বয়স থেকেই প্রহ্লাদ বিষ্ণুর পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। এজন্য তাঁর পিতা এবং শিক্ষকদের নিষেধ এবং বিভিন্ন ধরনের উপদেশ সত্ত্বেও স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদেরকে বিষ্ণুভক্ত হওয়া এবং তাঁর (বিষ্ণুর) সেবার জন্য সদুপদেশ দিতেন। শ্রীবিষ্ণুকে হিরণ্যকশিপু তার জাত শত্রু বলে মনে করত। এখন শত্রুর প্রতি পুত্র প্রহ্লাদের অচলা ভক্তি দেখে হিরণ্যকশিপু হতাশ হয়ে পড়ে। শেষে প্রহ্লাদকে বিভিন্ন উপায়ে মারার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় প্রতিবারই প্রহ্লাদ রক্ষা পেয়ে যান।

হোলিকা নামে হিরণ্যকশিপুর এক বোন ছিল। তার এমন একটি শাড়ি ছিল যা তাকে আগুন থেকে রক্ষা করতে পারতো। একদিন হোলিকা প্রহ্লাদকে নিয়ে ঐ শাড়ি পরে আগুনে ঝাঁপ দেয়, যাতে প্রহ্লাদ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। কিন্তু পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পান, বরং হোলিকা নিজেই অগ্নিগদ্ধ হয়ে মারা যায়। এই ঘটনা স্মরণ করেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের হিন্দুরা প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার দিন হোলি বা হোলিকা উৎসব পালন করে থাকেন।

কোনক্রমেই বিষ্ণুভক্তি থেকে বিচ্যুত করতে না পেরে একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁর পরিত্রাণকারী ভগবান কোথায় থাকেন? উত্তরে প্রহ্লাদ বলেন তিনি সর্বত্র এবং সব কিছুর মধ্যেই বিরাজ করেন। হিরণ্যকশিপু তখন একটি স্তম্ভ দেখিয়ে বলে এর মধ্যেও কি তিনি (ভগবান) আছেন। প্রহ্লাদ বলেন, হ্যাঁ। হিরণ্যকশিপু প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলে, তাহলে এখনই আমি তাঁকে মেরে ফেলব। এই বলে হিরণ্যকশিপু নিজের গদা দিয়ে জোরে ঐ স্তম্ভে আঘাত করে। তখনই ঘোর গর্জনে বজ্রের মতো শব্দ করে নৃসিংহদেব ঐ স্তম্ভে আবির্ভূত হন। বিড়াল যেমন ইদুঁরকে নিয়ে খেলা করে সেই ধরনের যুদ্ধ করে নৃসিংহদেব এক সময় হিরণ্যকশিপুকে তাঁর উরুতে স্থাপন করে হাতের আঙ্গুলের কঠিন নখাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব কিন্তু হিরণ্যকশিপুকে বধ করার সময় ব্রহ্মার প্রদত্ত সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। কারণ তিনি অর্ধমনুষ্য এবং অর্ধসিংহ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে গোধূলি সময়ে তার প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে নিহত করা হয়। এভাবে শ্রীনৃসিংহদেব তাঁর পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার পাশাপাশি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক অত্যাচারী শাসকের হাত থকে মুক্ত করেন। এইজন্য তাঁকে ভক্তবৎসল হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাঁর পূজার্চ্চনা করে থাকেন।

ইস্কন শ্রীধাম মায়াপুরে

শ্রীনৃসিংহদেবের আগমন

—আত্মতত্ত্ব দাসাধিকারী

১৯৮৪ সালের ২৪ শে মার্চ, রাত্রি ১২.২০ মিনিটে গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ৩৫ জনের এক ডাকাত দল শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয় মন্দির আক্রমণ করে। ওরা ভক্তদের হয়রান করে এবং গালাগালিও করছিল। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয় যখন ওরা শ্রীল প্রভুপাদের এবং শ্রীমতী রাধারাণীর বিগ্রহ অপরহণ করতে চেষ্টা করে। ভক্তরা নির্ভয়ে ডাকাতদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে যান। শ্রীল প্রভুপাদ আর শ্রীমতী রাধারাণীকে নিয়ে চলে যাবে, তাঁরা কি তাতে নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন? ডাকাতদের প্রতি গুলি ছোঁড়া হয়, কয়েকজন ডাকাত মারাও পড়ে, ওদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। শ্রীল প্রভুপাদকে উদ্ধার করা গিয়েছিল, কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীকে আর প্রধান বেদীতে বিদ্যমান দেখা গেল না।

এই ঘটনা ভক্তদের মনকে সত্যিই খুব নাড়া দিয়েছিল। এর একটি স্থায়ী সমাধান করার জন্য বিশেষত পরিচালক মণ্ডলী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এটা মায়াপুরের ভক্তদের প্রতি প্রথম আক্রমণ নয়। মায়াপুরের তৎকালীন যুগ্ম-নির্দেশক ভবানন্দ দাস মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেব প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ প্রদান করেন। যোগপীঠের ভক্তদেরকে যখন ডাকাতরা

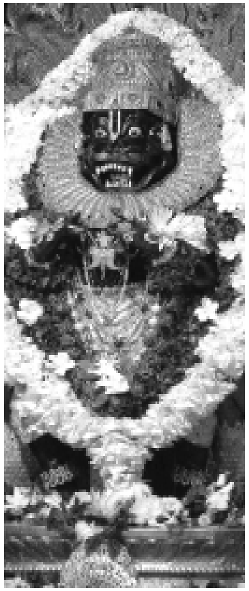

হুমকি দিচ্ছিল, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সত্বর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেব প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকে আর কোনও উপদ্রব হয়নি। মায়াপুরের অন্যান্য ভক্তরা অবশ্য এইভাবে তাঁদের অনুসরণ করতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। পূজারীকে হতে হবে আজন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, নৃসিংহদেবের পূজো করতে হবে কঠোর নিষ্ঠা সহকারে। তাঁর পূজো করতে কে প্রস্তুত আছে?

এই সমস্ত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ভবানন্দ দাস শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবকে মায়াপুরে আনতে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু আর আমাকে তার কয়েকটি ছবি আঁকতে বললেন। একদিন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি বললেন যে, শ্রীবিগ্রহের পা দুটি হবে বাঁকানো, লাফিয়ে পড়তে প্রস্তুত, তিনি দেখতে হবেন, হিংস্রভাবে এদিক ওদিক দেখছেন এমন, তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি থাকবে একটু বাঁকানো, তাঁর মস্তক থেকে আগুনের মতো শিখা নির্গত হবে। এই ধরনের একটি বিগ্রহের ছবি আমি অঙ্কন করি।

ভক্তরা তা পছন্দ করলেন, পঙ্কজাঙ্ঘ্রী দাস তাঁর অর্চন করতে রাজী হলেন। কলকাতার একজন ধনাঢ্য ভক্ত রাধাপদ দাস ঐ বিগ্রহ নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে চাইলেন। তাতে মনে হল, ইসকন মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব ঘটানো একটি বেশ সহজসাধ্য ব্যাপার হবে। রাধাপদ দাস সত্বর ১,৩০,০০০ টাকা দান করলেন, তাতে মাস তিনেকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহ প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এই সব কাজের জন্য আমি দক্ষিণ ভারতে গেলাম। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় খুব সত্বর আমি একজন বিখ্যাত ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। এই ভাস্কর কিন্তু শুধু বিগ্রহ খোদাই করেন তা-ই নন, তিনি একজন মন্দিরের ভাস্কর এবং বাস্তুকারও বটে। আমরা যে তাঁকে উগ্রনৃসিংহ বিগ্রহ খোদাই করতে বলব তা না জানা পর্যন্ত তিনি ভালই কথাবার্তা বলছিলেন। এইরূপ বিগ্রহ বানানোর প্রস্তাব দিলে তিনি তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি আরও অনেক ভাস্করের নিকট গেলাম, কিন্তু উত্তর সব জায়গা থেকে একই পাওয়া গেল ঃ না। মায়াপুর থেকে দক্ষিণ ভারতে যাতায়াত বেশ কয়েকবার করলাম, ছয় মাস কেটে গেল, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীবিগ্রহরূপে এখনও প্রকট হলেন না।

মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা দেখার জন্য রাধাপদ দাস অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তিনি আমাকে বললেন, আমি যে ভাস্করের নিকট প্রথমে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে

যেন আমাদের আবেদনটি পুনরায় পেশ করি। এইবার ঐ ভাস্করকে যেন একটু সদয় বলে মনে হল, উনি আমাকে শিল্প-শাস্ত্র (মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এবং ভাস্কর্য বিষয়ক বৈদিক শাস্ত্র) থেকে একটি অধ্যায় পড়তে দিলেন, যেখানে বিভিন্ন বিগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে, শ্রীনৃসিংহদেবের বর্ণনা সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোক তিনি জোরে জোরে নিজেও পাঠ করলেন। তাঁর অগ্নিশিখার মতো কেশর বেশ কয়েকটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি আর তাঁর হাঁটু ভাঁজানো, একটি পা সামনের দিকে বাড়ানো, স্তম্ভ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। উনি যখন এই সমস্ত পাঠ করলেন, আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম! এইটিই তো আমরা চাইছি। আমি যে ছবি এঁকেছিলাম, তা উনাকে দেখালাম। তিনি তাতে খুশী হলেন এবং তিনি নিজে শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুসারে বিগ্রহ খোদাই-এর সহায়ক একখানি ছক করলেন। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি অবশ্য নিজে ঐ বিগ্রহ খোদাই করবেন না। এক সপ্তাহ ধরে তিনি ঐ ছবিটি আঁকলেন, আর তা হয়েছিলও খুব সুন্দর। আমি মায়াপুরে ফিরে এসে কর্তৃপক্ষকে ঐ ছবিখানি দেখালাম। প্রত্যেকেই চাইলেন যে, ঐ ভাস্করই যেন ঐ বিগ্রহ খোদাই করেন। তাঁকে রাজী করার জন্য আবার আমাকে দক্ষিণ ভারতে যেতে হল।

আমি সোজা ঐ ভাস্করের বাড়ীতে গেলাম। বড় উদ্বেগে ছিলাম। শ্রীনৃসিংহদেব যেন কৃপা করে শ্রীমায়াপুর ধামে আমাদের মন্দিরে প্রকট হতে রাজী হন, —এই প্রার্থনা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি? আমি তাঁকে দুটো কথা বলতে না বলতেই উনি বললেন যে, তিনি শ্রীবিগ্রহ খোদাই করবেন। কীভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা এক মজার ব্যাপার।

এই ভাস্কর আমাদের অনুরোধ নিয়ে তাঁর গুরুদেব কাঞ্চিপুরমের শঙ্করাচার্যের নিকট গিয়েছিলেন। তাঁর গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন—''করবে না। তোমার বংশনাশ হবে।'' মুহূর্ত কাল চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ''এই বিগ্রহ খোদাই করতে তোমাকে কে বলছে?'' যখন তিনি শুনলেন যে, নবদ্বীপ থেকে হরেকৃষ্ণ ভক্তরা চাইছেন, তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ''ওরা উগ্রনৃসিংহ চাইছে? উগ্রনৃসিংহ খোদাই করা আর তা প্রতিষ্ঠা করার জটিলতা সম্বন্ধে কি ওদের কোন ধারণা আছে? ৩০০০ বৎসর পূর্বে খুবই উন্নত ভাস্করেরা কেবল এইরূপ বিগ্রহ বানাতেন। মহিশূরে যেতে এক জায়গায় এক ভয়ঙ্কর উগ্রনৃসিংহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নৃসিংহদেব তাঁর কোলের উপর অসুর হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করে তার নাড়িভুড়ী বের করে সারা বেদীর উপর ছড়িয়েছেন। ওখানকার অর্চন ছিল খুব উচ্চ মানের, ওখানে প্রতিদিন হাতী সহযোগে শোভাযাত্রা করে উৎসব হত। কালক্রমে অর্চনে ভাঁটা পড়ে। বর্তমানে ঐ স্থান যেন একটি ভুতুড়ে শহর। পুরো গ্রামটিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কেউ ওখানে শান্তিতে থাকতে পারে না। ওরাও কি ওদের ওখানে তেমনটি চাইছে?''

ভাস্কর বললেন, ''ওরা একেবারে নাছোড়বান্দা। প্রতিনিয়ত ওরা আমার নিকট বিগ্রহ সম্বন্ধে কথা বলতে আসছে। মনে হয় ওদের ডাকাত নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে।'' বিগ্রহের একটি ছবি তাঁর গুরুদেবের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, ''ওরা এই বিগ্রহ চাইছে।'' তাঁর গুরুদেব ছবিটি নিয়ে খুব ভালোভাবে দেখলেন।

তিনি বললেন, ''ও,এ তো উগ্র শ্রেণীর, কিন্তু এই বিশেষ ভাবের বিগ্রহকে বলা হয় স্থানু-নৃসিংহ। এই পৃথিবীর কোথাও উনি নেই। এমনকি স্বর্গে দেবতারাও এই রূপের আরাধনা করেন না। হ্যাঁ, এই বিগ্রহ উগ্র শ্রেণীর। উগ্র মানে ভয়ঙ্কর, ভীষণ ক্রুদ্ধ। এই শ্রেণীতে নয় প্রকার রূপ রয়েছে। এঁরা সকলেই খুব ভয়ঙ্কর। এরা যেটা চাইছে স্থানু-নৃসিংহ ঃ স্তম্ভ থেকে বেরোচ্ছেন। না। এ বিগ্রহ খোদাই করো না। তোমার জন্য তা মঙ্গলজনক হবে না। এ সম্বন্ধে আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।''

কয়েকদিন পর ঐ ভাস্কর একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তাঁর গুরুদেব এসে তাঁকে বললেন, ওদের জন্য তুমি স্থানু-নৃসিংহ খোদাই করতে পার। পরের দিন তিনি কাঞ্চিপুরম থেকে লোকমারফৎ প্রেরিত একখানি পত্র পান। ঐ পত্রখানি শঙ্করাচার্য প্রেরিত, তাতে তিনি মন্দির সংস্কার সংক্রান্ত কিছু উপদেশ প্রদান করেছেন। তার নীচে একটি পাদটিকা ছিল। তাতে লেখা ছিল, ''ইসকনের জন্য তুমি স্থানু-নৃসিংহ খোদাই করতে পার।''

ভাস্কর আমাকে ঐ পত্রখানি দেখিয়ে বললেন, ''আমার গুরুদেব আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। আপনাদের বিগ্রহ আমি বানিয়ে দেব।'' আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠি। আমি উনাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিলাম, আর জিজ্ঞাসা করলাম, বিগ্রহ খোদাই করতে কত সময় লাগবে? তিনি বললেন ছয় মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহ তৈরী হয়ে যাবে। আমি মায়াপুরে ফিরে আসি।

পবিত্র ধামে চারমাস নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আমি ভাবলাম দক্ষিণ ভারতে গিয়ে নৃসিংহদেবের পূজোর জন্য প্রয়োজনীয় ভারী ওজনের পেতলের জিনিসপত্র কিনে তারপর বিগ্রহ নিয়ে ফিরব। ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত, সেই যাত্রা ছিল সুব্যবস্থিত ও নির্বিঘ্নের। আমি উনাকে বললাম, পূজোর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র কেনা হয়ে গিয়েছে, আমি বিগ্রহ নিতে এসেছি। ভাস্কর আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, আমি

বোধ হয় বড় নির্বোধ, উনি বলে উঠলেন, ''কি বিগ্রহ? আমি এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত শিলা-ই পাইনি।'' আমি তো তা ভেবে উঠতেই পারছিলাম না। আমি বললাম, ''আপনি আমায় বলেছিলেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবেন।'' উনি বললেন, ''আমি আমার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখব, শিলা পাওয়ার ছয় মাস পরে প্রতিষ্ঠার জন্য বিগ্রহ প্রস্তুত হয়ে যাবে।'' কথাগুলো উনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, কিন্তু এত দেরী হওয়ার কারণ কী তা আমি বুঝতেও পারছিলাম না আর তা মেনে নিতেও পারছিলাম না। আমি হতাশ হয়ে প্রতিবাদ করলাম, ''সারা দক্ষিণ ভারত জুড়ে কত বড় বড় শিলাখণ্ড রয়েছে। সমস্যাটা কোথায়?'' শিক্ষক যেভাবে তাঁর কম বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রের দিকে দেখতে থাকেন, উনি যেন আমার দিকে সেইভাবেই দেখছিলেন, উনি সুচিন্তিত ভাবে বললেন, '' আমি কোনও উদুখল বানাচ্ছি না। আমি শ্রীবিগ্রহ বানাচ্ছি। শাস্ত্র আমাদের বলেন যে, বিষ্ণুবিগ্রহ বানাতে কেবল জীবন্ত শিলা-ই ব্যবহার করা যাবে। যে শিলাখণ্ডের সাতটি স্থানে আঘাত করলে প্রতিটি স্থান থেকে শাস্ত্রানুসারে শব্দ উৎপন্ন হবে, সেই শিলা হবে যথার্থ। আবার আর একভাবেও ঐ শিলা জীবন্ত কি না নির্ধারণ করা যায়। এক রকমের পোকা আছে, ওরা স্ফটিক ধরনের শিলা খায়। ঐ পোকা যদি সেই শিলার এক প্রান্ত থেকে খেয়ে ছিদ্র করে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসে, আর তাতে ঐ ছিদ্র বরাবর থাকে, তাহলে সেটি যে জীবন্ত শিলা তাতে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। এই ধরনের শিলাখণ্ড থেকেই কেবল আপনার নৃসিংহদেব বানানো যাবে। এই ধরনের শিলা কবিতা বলে। এইরূপ শিলা থেকে খোদাই করা শ্রীবিগ্রহের মধ্যে যথার্থ বিগ্রহের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হবে। ধৈর্য ধরুন। আমি আন্তরিকাতর সঙ্গে এক খণ্ড ছয় ফুটের শিলা অনুসন্ধান করছি।''

আমি চমৎকৃত, আবার একটু উদ্বিগ্নও। মায়াপুরের ভক্তরা খুব সত্বর বিগ্রহ আসবে বলে চেয়ে আছেন। আমি এখন তাঁদের নিকট কিভাবে এই 'জীবন্ত শিলা' অনুসন্ধান ব্যাখ্যা করব? তাঁরা হয়তো নৃসিংহদেবের মর্মর বিগ্রহই চেয়ে বসবেন। আমি ভাবলাম প্রহ্লাদ মহারাজের মূর্তির ব্যাপারে ভাস্করের সঙ্গে আলোচনা করব। ''মাফ করবেন, আমি গতবারে যখন আপনার কাছে এসেছিলাম, বলতে ভুলে গেছি, আমরা প্রহ্লাদ মূর্তিও চাই। আমরা প্রহ্লাদ-নৃসিংহদেব অর্চন করতে চাই। আপনার কী অভিমত?''

ভাস্কর নিশ্চিত করে বললেন, ''আমার মনে হয় না তা সম্ভব হবে।'' আমি হতবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। উনি মুচকি হেসে বললেন, ''আপনারা চান সব কিছু হবে যথাযথ শাস্ত্র অনুসারে। আপনাদের নৃসিংহদেব হবেন চারফুট উঁচু। তুলনামূলকভাবে হিসাব করলে আপনার প্রহ্লাদ মহারাজ হবেন জীবানুর আকারের।''

আমি বললাম, ''আমরা চাই এক ফুট উঁচু প্রহ্লাদ মহারাজ।''

ভাস্কর বললেন, '' বেশ, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আপনাদের নৃসিংহদেব হবেন ১২০

ফুট মতো উঁচু।'' প্রহ্লাদ মহারাজের আকার নিয়ে আমরা অনেক যুক্তিতর্ক করতে লাগলাম। অবশেষে ভাস্কর মশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে এক ফুট উঁচু প্রহ্লাদ মহারাজ বানাতে রাজী হলেন। এবার মায়াপুরে ফিরে গেলে আমি কিছু সুখবর দিতে পারব।

দু'মাস পরে আমি দক্ষিণ ভারতে ফিরে আসি। অগ্রগতি কিছুই হয়নি। প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ দিনে একবার করে আমি দক্ষিণ ভারত আর মায়াপুর যাতায়াত করতে থাকলাম। তারপর শিলা পাওয়া গেল, আর ঐ ভাস্কর যেন তখন একজন ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছেন। এক সপ্তাহের ওপর উনি বাড়ীতেই যাননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, তিনি ঐ শিলাখণ্ডই নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। উনার হাতে চক্ ছিল কিন্তু তা দিয়ে কিছুই আঁকেননি। তিনি তাঁর শ্রমিকদেরও কেবলমাত্র শিলাখণ্ডকে আয়ত করতে বাকী অংশগুলি বাদ দিতে বলেছিলেন। পরের বারে যখন ওনার নিকট গেলাম, তখন উনি ঐ শিলার ওপর একটি ছক্ করেছেন মাত্র। এই ব্যাস্। আমি তো চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মায়াপুরের পরিচালক মণ্ডলী এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

আমি হতাশ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনি কি নিশ্চিত যে, ছয় মাসের মধ্যে আপনি বিগ্রহের কাজ শেষ করতে পারবেন?''

উনি বললেন, ''ব্যাস্ত হবেন না, কাজ হয়ে যাবে।'' আমি মায়াপুরে ফেরা মাত্রই আবার দক্ষিণ ভারত যেতে হল, বিগ্রহের আরও কিছু বিস্তারিত ব্যাপার, সেগুলি ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেই নিয়ে। আমি ঐ ভাস্করকে দেখলাম উনি গভীর মনোযোগ এবং যত্ন সহকারে এবং নিজে হাতেই বিগ্রহ খোদাই করছেন। সেই পর্যায়ে সেটি আর শিলা নেই, বিগ্রহের আকার এসে গেছে। ভাস্কর তখন বিগ্রহের বাহুতে অনন্ত বানাতে শুরু করেছেন। সেগুলো করতে আর দু'সপ্তাহ লেগেছিল। সব কিছুই খবু সূক্ষ্ম এবং মসৃণ করা হয়েছিল। আমি তা দেখে খুব সুখী এবং প্রভাবিত হয়েছিলাম। বিগ্রহ সম্পূর্ণ করতে ঐ ভাস্করের প্রায় এক বছরের একটু বেশী সময় লেগেছিল। বিগ্রহ সম্পূর্ণ করেই আমাকে উনি খবর দেননি, উনি কয়েক দিনের জন্য কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে যাবেন ভেবেছিলেন। তখন ছিল বর্ষাকাল, কিছু লোক উনাদের বাড়ীতে বেড়াতেও এসেছিলেন, তাই তিনি ভেবেছিলেন, নৃসিংহদেবকে ঐ চালাঘরে তালা মেরে রাখলেই নিরাপদ। দু'দিন বাদে তাঁর একজন প্রতিবেশী ছুটে এসে খবর দিলেন যে সেই চালাঘরে আগুণ লেগেছিল। প্রচুর বৃষ্টি হয়ে সব কিছু ছিল ভেজা, কিন্তু নারকেল পাতার ছাউনিতে আগুন ধরে গেছে। তিনি ছুটে গিয়ে দেখলেন নৃসিংহদেব অক্ষত, কিন্তু ছাউনি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উনি আমায় ফোন করেছেন, ''দয়া করে আপনার বিগ্রহ নিয়ে যান। উনি সব পুড়িয়ে ফেলছেন। উনি যে এক্ষণই যেতে চাইছেন এ থেকে বোঝা যাচ্ছে।''

উৎসাহের সঙ্গে আমি দক্ষিণ ভারতে গেলাম, একটি লরী ভাড়া করলাম, তাতে অর্ধেকটা

বালি দিয়ে ভর্তি করা হল। আমি ভাস্করের কার্যালয়ে এসে ভাবলাম এরপর কাজগুলো সহজ হবে। আমি ভুলেই গেছিলাম যে, নৃসিংহদেব ভীষণ ওজনদার ব্যক্তিত্ব ঃ ওনার ওজন এক টন! দু'তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালানোর পর আমরা বিগ্রহকে ছাউনি থেকে নিরাপদে লরীতে ওঠালাম। নিরাপদে রাজ্য সীমানাগুলি পার করতে আমাদের পুলিশের অনুমোদন, কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর বিভাগের অনুমোদন পত্র, নৃতত্ব বিভাগের নির্দেশক আর সেই সঙ্গে তামিলনাড়ুর শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকের অনুমোদন সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দস্তখত করার আগে প্রতিটি আধিকারিক বিগ্রহ দর্শন করতে চাইছিলেন। নৃসিংহদেবের দর্শন করা মাত্রই ওঁরা খুব সহযোগী এবং সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে গিয়েছি— ভারত সরকারের আমলাদের থেকে এতটা সহযোগিতা পাওয়া ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার। মায়াপুরে ফিরে আসার সময়ও আমাদের ভ্রমণ ছিল শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিঘ্ন, কারণ আমাদের রক্ষক আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

সাধারণত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন ভাস্কর নিজে গর্ভগৃহে গিয়ে বিগ্রহের চক্ষু খোদাই করেন। একে বলে নেত্রোন্মিলনম্ (নেত্রদান)। আমাদের নৃসিংহদেবের ক্ষেত্রে তা ছিল এক ব্যতিক্রম, ভাস্কর ইতিমধ্যেই নেত্রদান করে দিয়েছেন। তিনি শুধু নেত্রদানই করেননি, তিনি বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করেছেন, তাতে একটু পূজা এবং আরতিও করতে হয়। এই জন্যই সমস্ত কাগজপত্র এত সত্বর পাওয়া গিয়েছিল আর পরমেশ্বর ভগবানকে নিয়ে আসাও খুব সহজ হয়েছিল—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি উপস্থিত ছিলেন। আব ভগবান নৃসিংহদেবকে 'না' বলবে এমন সাধ্য কার?

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান ছিল খুব সোজা, তাতে তিনদিন লেগেছিল ঃ ২৮-৩০ শে জুলাই ১৯৮৬। আমার মনে হয়েছিল এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বুঝি সহজে হয়ে গেল। কাঞ্চিপুরমের শঙ্করাচার্যের গম্ভীর সতর্কবাণী আমাকে গভীরভাবে চিন্তিত করেছিল। কিন্তু উচ্চ, প্রাণবন্ত কীর্তন শ্রবণ করে আমি শান্তি অনুভব করেছিলাম। কলিযুগের একমাত্র যথার্থ ঐশ্বর্য সংকীর্তন যজ্ঞ সম্পূর্ণ ব্যাপারটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাতে আমি উজ্জীবিত ও সন্তুষ্ট বোধ করেছিলাম। এতদিনে সংকীর্তন আন্দোলনের রক্ষক শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয় মন্দিরে নিজেকে প্রকাশ করলেন। জয় শ্রীনৃসিংহদেব ভগবান কি— জয়! প্রহ্লাদ মহারাজ কি— জয়!!

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের দিব্য লীলা

—পঙ্কজাঙঘ্রী দাস ব্রহ্মচারী

ভগবান ও ভগবানের ভক্তদের ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কিত কাহিনীকে বলা হয় 'লীলা'। আমাকে যেহেতু ভক্তরা মায়াপুরে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের পূজারী হিসেবে চেনেন, তাঁরা আমাকে নৃসিংহদেবের কিছু সাম্প্রতিক লীলা বলতে অনুরোধ করেন। এই লীলাগুলি অবশ্যই শাস্ত্রের মতো নয়, কারণ এসব লীলা যেসমস্ত ভক্ত আমাদের বলেছেন, তাঁরা ছাড়া বেশি কোনও প্রমাণ আমাদের নেই। অধিকাংশ সময়ে তাঁরা ছাড়া সেই ঘটনার আর কোনও সাক্ষীও ছিল না। যদিও অন্য কারও অলৌকিক কোন অভিজ্ঞতাকে সহজে মেনে নেওয়ার পাত্র আমি নই, কিন্তু সম্প্রতি অনেক কিছু ঘটতে শুরু করেছে, তাই আমি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলাম না।

বিগত গৌর পূর্ণিমায় একজন মহিলা-ভক্তকে ডেকে আমি তাকে মহিলাদের মধ্যে নৃসিংহদেবের চরণামৃত বিতরণ করতে বলি এবং তা সে পালন করে। চরণামৃতের পাত্র ফিরিয়ে এনে, সে বলল যে —ভগবান নৃসিংহদেব তার ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছেন।

সে বলল—''আমি আজ সকালে তাঁর (নৃসিংহদেবের) কাছে প্রার্থনা করছিলাম, আমি যদি তাঁর কোন প্রত্যক্ষ সেবায় যুক্ত হতে পারি।''

আমি বললাম—'' সত্যি, পবিত্র ধামে মনোবাসনা খুব সত্বর পূর্ণ হয়। দেখনা—একই দিনে তুমি কামনা করলে আর তা পূর্ণও হলো।''

—''একই দিনে নয়, সেই মুহূর্তে। যখনই আমি তাঁর সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, তখনই আপনি আমাকে ডাকলেন।''

আমি বললাম—''বাঃ! কি চমৎকার। তুমি কি সেই আত্মরতি মাতাজীর ঘটনা শুনেছ, যার চোখ নিয়ে সমস্যা ছিল? ওনার দৃষ্টি শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল, তাই তিনি ভগবান নৃসিংহদেবের শরণাগত হন। তখনই নৃসিংহদেবের দিব্য কণ্ঠস্বর শুনতে পান—''পূজারীকে আমার আগের চোখ দুটি ফিরিয়ে দিতে বলো।'' তখন সেই মাতাজী আমাকে জানালে, আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব—বললে, তিনি চলে যান।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম, কারণ কয়েকদিন পূর্বে একজন ভক্ত নৃসিংহদেবের জন্য দুটি নতুন চোখ দান করলে, পূর্বের ব্যবহৃত চোখ দুটি খুলে নতুনগুলো ভগবানকে পরিয়েছিলাম। সেই অসুস্থ মাতাজীর কথায় আমি ভগবান নৃসিংহদেবের অভিপ্রায় বুঝতে

পারি এবং পরক্ষণেই তাঁর পূর্বের চোখ দুটো পরালাম। বিকালবেলা সেই মাতাজী এসে বললেন যে, তাঁর চোখের যাবতীয় সমস্যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। আমার কথা শুনে মাতাজী বলল—''হ্যাঁ, আমি জানি। আমি শুনেছি, সেই রাত্রে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর সাথে কথা বলেছেন। আমি পাশের ফ্লাটে ছিলাম। সেই রাত্রে নৃসিংহদেবের দিব্য তেজে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল। আমরা সারারাত ঘুমোতে পারিনি।''

এর কয়েক দিন পরেই আর একজন ভক্ত বললেন, কিভাবে নৃসিংহদেব তাঁকে সাহায্য করেছেন—

''আমি খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। নৃসিংহদেব-মন্দিরের সামনে স্তম্ভে হেলান না দিয়ে দাঁড়াতেও পারছিলাম না। আমি প্রার্থনা করলাম, '' হে নৃসিংহদেব! আপনি আমার এই যন্ত্রণা দূর করুন, যাতে পূর্ণরূপে আমি আপনার সেবা করতে পারি।''

এই প্রার্থনার পরই আমি অনুভব করলাম যে, ক্রমশ আমার দেহের সমস্ত যন্ত্রণা উপর দিকে উঠে আমার শরীর থেকে বিদূরিত হচ্ছে। সমস্ত যন্ত্রণা সত্যিই দূর হয়ে গেল।''

এক মাতাজী নৃসিংহদেবের দর্শনে এসেছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, গত দু'সপ্তাহ থেকে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার দরুন আসামে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ করতে যেতে পারছেন না। এদিকে প্লেনের টিকেট কাটা আছে। শ্রীবিগ্রহের সেবাটা অত্যন্ত জরুরী। এমতাবস্থায় তিনি আমার পরামর্শ চাইলেন। আমি তাঁকে উৎসাহের সঙ্গে বললাম—''মাতাজী, ভগবান নৃসিংহদেব আজকাল ভক্তের প্রার্থনা শ্রবণমাত্রই অভীষ্ট পূরণ করছেন। আপনিও যান, ওনাকে আপনার সমস্যার কথা বলুন।''

ঠিক পরের দিন সকালে ওনার সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি বললেন---''আপনার উপদেশের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। জানেন, যখন মন্দির থেকে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম, তৎক্ষণাৎ আমার সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল।''

কয়েকদিন পরে অপর এক মাতাজী পূজারীদের ঘরে এসে তাঁর স্বপ্নের সম্বন্ধে বললেন—''নৃসিংহদেব পিতার মতো তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করছিলেন। তখন তিনি শ্রীনৃসিংহদেবকে কীভাবে সেবা করতে পারেন, জিজ্ঞাসা করলে, শ্রীনৃসিংহদেব

বললেন—''আমাকে কিছু আম খাওয়াতে পার?''

সপ্তাহ খানেক পরে সেই মাতাজী যখন নিবেদন করার জন্য আম এনেছিল, তখন আর কয়েক জন্য পূজারীকে জননিবাস প্রভু বলেছিলেন, সেই মাতাজী কত ভাগ্যবতী যে, ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব তার স্বপ্নে এসে তার সঙ্গে কথা বলে, তার হাত ধরে চলাফেরা করতে করতে, তাকে ব্যাক্তি(গত নির্দেশও প্রদান করেছেন। মাতাজী তখন আশ্চর্য হয়ে বলেছিল আমি আপনাকে সেই স্বপ্ন সম্বন্ধে আগে যা বলেছিলাম, প্রকৃত প(তার আরও কিছু অংশ বাকি থেকে গেছে। আসলে স্বপ্নের অর্ধেক অংশ বলেছি। ভগবান নৃসিংহদেব আমায় বলেছেন--আমার পূজারী আমার খুবই প্রিয়, তাই আমি ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিতে চাই।''

—''না, না, অনুগ্রহ করে তা করবেন না।'' আমি ভয়ে শিউরে উঠি। ''আমরা চাই উনি এখানে থাকুন।''

—''না, আমি ওকে ফিরিয়ে নেওয়াই মনস্থ করেছি।''

—ভগবানের নিকট দীর্ঘ সময় কাকুতি-মিনতি করার পর, ভগবান ঘোষণা করলেন—''ঠিক আছে, তা হলে ওর পরিবর্তে একজন নেতাকেই উঠিয়ে নেব।''

এখন তো আপনারা জানেন, মাত্র কয়েকদিন আগে শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ আপাতচ(হৃদ্‌রোগে আত্র(ান্ত হয়ে আকস্মাৎ দেহত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন গু(, সন্ন্যাসী এবং জিবিসি। সেটি আমি আগে উল্লেখ করিনি কেননা অন্যেরা হয়তো তাতে অখুশী হতো, কিন্তু এখন সেটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমার মনে হয় এখন এই ব্যাপারটি আপনাকে বলা ঠিকই হবে।

এই ঘটনা যখন আমার ক্যারোলিনার বন্ধু বি(্ভরকে বলি, তিনি বললেন, ''ভারি আশ্চর্য! আমার স্ত্রীও নৃসিংহদেব ও আমের স্বপ্ন দেখেছে। গতকাল যখন আমার স্ত্রী মায়াপুর মন্দিরের বাইরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দোকানে আমের আচার দেখে নৃসিংহদেবের জন্য কিনতে চাইছিল। কিন্তু আচারের শুদ্ধতার প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে তা সে কিনল না। গতকাল রাত্রে ভগবান নৃসিংহদেব স্বপ্নে তাকে জিজ্ঞাসা করেন—''আমের আচার কোথায়?''

যখন শ্রীনৃসিংহদেব প্রথম মায়াপুরে আসেন, পূজারীরা তাঁর সেবা করতে ভয় পেত। বিশেষত ভবসিদ্ধি দাস তাঁর পূজো করতে ভীষণ ভয় পেত। একদিন রাত্রে নৃসিংহদেবের শয়ন দিয়ে বেরিয়ে যাবে(হঠাৎ এক প্রচণ্ড আওয়াজ—তার সারা শরীর শিউরে ওঠে। ভীত চ(সে পিছন ফিরে দেখে—সবই ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি সে দরজা বন্ধ করে প্রণাম জানিয়ে, অজ্ঞাতসারে হয়ে যাওয়া কোনও অপরাধের (মা ভি(া করে ঘরে ফিরে আসে।

শেষ রাত্রে বিছানা কেঁপে ওঠায় তার ঘুম ভাঙ্গে, ভবসিদ্ধি উপরের বাঙ্কে ঘুমিয়েছিল।

সে ভাবল—সময় হয়ে গেছে, মঙ্গল আরতিতে যেতে হবে, তাই নীচে শুয়ে থাকা পূজারী বোধ হয় তাকে ডাকছে।

চোখ মেলে দেখে—শ্রীনৃসিংহদেব তার বিছানায় বসে। সেই ভাগ্যবান আতঙ্কিত পূজারী ওঠার চেষ্টা করতেই ভগবান তার দুই কাঁধ চেপে ধরেন। তাঁর করদ্বয় যেন ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করছে। ভগবান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—''শান্ত হও! শান্ত হও! আমি তোমায় শুধু বলতে এসেছি যে, যখন তুমি মন্দিরে আমার সেবা কর, আমাকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ভয় ত্যাগ কর।''

তারপরেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। কিন্তু ভবসিদ্ধি চত্র(ভবনের বারান্দায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে থাকে। ভত্ত(রা তাকে জিজ্ঞাসা করে—'' কি হয়েছে?'' —তারা কিছু অসংলগ্ন উত্তর পায়। শেষে ভবসিদ্ধি ছুটে যায় নৃসিংহদেবের মন্দিরে এবং আকুতিভরে ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করে প্রার্থনা জানাতে থাকে। কিছু(ণ পরে সে একটু শান্ত হয় এবং ঘরে ফিরে আসে। সে ভাবতে থাকে, কেন সবাই তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। তারপর সে উপলব্ধি করে—তাইতো, সে রাতের পোশাক পরেই মন্দিরে গিয়েছিল।

তারপর গত গৌর-পূর্ণিমায় ভবসিদ্ধির সাথে আমার দেখা হয়েছিল—ও এখন আমেরিকায় থাকে। এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

ও বলেছিল—''হ্যাঁ! আমার কাঁধে এখনও ভগবান নৃসিংহদেবের দুই হাতের চিহ(বর্তমান। যদিও অনেকটা মুছে গেছে, তবুও বোঝা যায়।''

সে-ই কেবল নৃসিংহদেবের দর্শন পেয়েছে তা নয়। একদিন পাশের মঠের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ভত্ত(নৃসিংহদেবের পূজো দিতে এসে আমাদের প্রধান পূজারী জননিবাস প্রভুকে বলেন—''নৃসিংহ-চতুর্দশীর দিনে রাত্রি জাগরণ করে জপ করছিলাম। রাত্রি শেষে দেখি যে, ভগবান নৃসিংহদেব আমার ঘরে উপস্থিত। মৃদু হাস্যযুত্ত(আমাদের এই মন্দিরের নৃসিংহদেব আমার সামনে। তাঁর পরনে ছিল লাল পোষাক। আমার গু(মহারাজকে জানালে তিনি বলেন—তুমি খুব ভাগ্যবান। তোমার উচিত তাঁর পূজো দেওয়া।''

একবার এক পুত্রহারা পিতা-মাতা সারা দেশ খুঁজে শেষে তাঁরা খবর পেলেন, তাঁদের ছেলে মায়াপুরে আমাদের মন্দিরে রয়েছে। তৎ(ণাৎ তাঁরা মায়াপুরে এসে সারাদিন ধরে তাঁদের সন্তানের অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন। কখনও অনুসন্ধান অফিসে, কখনও বা বিভিন্ন ভত্ত(দের নিকট জিজ্ঞাসা করছিলেন, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাননি।

দিনের শেষে, সন্ধ্যা আরতির পর নৃসিংহদেবের আরতি হচ্ছে। ছেলেটির মা করজোড়ে নৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করছেন—'' হে ভগবান! গতবার যখন এসেছিলাম, আমি

তখন আনন্দের সাথে নৃত্য-কীর্তন করেছিলাম। কিন্তু এখন হৃদয় ভারাক্রান্ত, কারণ আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি, তাই জীবনে কোন আনন্দ পাচ্ছি না। হে ভগবান! আমার একমাত্র ছেলে যদি ফিরে আসে তাহলে আমিও দু'হাত তুলে বলবো—হরিবোল! হরেকৃষ্ণ!!"

এই প্রার্থনা করা মাত্র তাঁর ছেলে নৃসিংহদেব ও তাঁর মাঝে এসে দাঁড়াল। পিতা-মাতা উভয়েই এখন দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, নামহট্ট কেন্দ্র শুরু করে তাঁরা উৎসাহের সাথে ভগবৎ-মহিমা প্রচার করছেন।

আরও অনেক—অনেক কাহিনী আছে—কিন্তু সেগুলো বলতে আমার অস্বস্তি হবে। আমি বলতে পারব না। কারণ, না বলার জন্য আমি তাঁদের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যেসকল ভক্ত আমাকে এই কাহিনীগুলো বলেছেন, তাঁদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা আরও জোরালো হয়েছে। অবশ্যই আমারও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বর্ধিত হয়েছে। শাস্ত্র না হলেও এই কাহিনীগুলো পাঠ করলে অন্যেরাও সমানভাবে উপকৃত হবেন। এই কাহিনীগুলো আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃতে অগ্রগতির সহায়ক।

পঙ্কজাঙ্ঘ্রি দাস ১৯৭৩ সালে ইংল্যাণ্ডের ইস্কন মন্দিরে যোগদান করেন। তাঁর জমজ ভ্রাতা জননিবাস প্রভু সেই সময়ে শ্রীধাম মায়াপুরে ছিলেন। পরের বছর পঙ্কজাঙ্ঘ্রি প্রভুও মায়াপুরে চলে আসেন। তখন থেকেই এই জমজ ভ্রাতৃদ্বয় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের সেবা নিখুঁত ভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৮৬ সালে মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে তিনিই তাঁর প্রধান সেবক রূপে সেবা করে আসছেন। এই জমজ পূজারী ভ্রাতৃদ্বয়ের ঐকান্তিকতা এবং শুদ্ধতা বৈষ্ণব সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

—মায়াপুর জার্নাল থেকে গৃহীত।

আমি আমার চোখ ফেরৎ চাই

গ্রীসের আত্মরতি দাসী ইস্কনে ১৯৮০ সালে যোগদান করেন। তিনি বর্তমানে শ্রীধাম মায়াপুরে বসবাস করছেন। তার স্বামীর নাম গোকুলানন্দ দাস এবং কন্যার নাম গৌরলীলা দাসী। আত্মরতি দাসীর কোন কারণে এক সময় চোখের দৃষ্টি অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। একদিন ভগবান নৃসিংহদেবের পরম ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ সমীপে কৃপা প্রার্থনার সময় তিনি দেখতে পান শ্রীনৃসিংহদেব বলছেন, তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিলে আত্মরতির চোখ ভাল হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট পূজারীকে এই ঘটনা জানালে ভগবান নৃসিংহদেবের চোখ পরিবর্তন করা

হয়। এর পরই তিনদিনের মধ্যে আত্মরতি দাসীর চোখের দৃষ্টি ভাল হয়ে যায়। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা তিনি 'হরে কৃষ্ণ টু-ডে' পত্রিকায় লিখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন। এর বঙ্গানুবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

গত বছর গ্রীষ্মকালের একদিন সকালে আনুমানিক ১১টার সময় আমি মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে যাই। সেখানে প্রভু নৃসিংহদেবের পরমভক্ত প্রহ্লাদের উদ্দেশ্যে আমার বিনীত প্রার্থনা জানাই। ঐ সময় বিস্ময়ের সাথে আমি প্রভুর এক মন্দির লীলা প্রত্যক্ষ করি।

মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেবের সামনে ভক্ত প্রহ্লাদ হাতজোড় করে দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে আমি প্রার্থনা জানাইঃ '' হে সুপ্রিয় প্রহ্লাদ, আপনি প্রভু নৃসিংহদেবের কাছ থেকে সব ধরনের কৃপা গ্রহণে অতুলনীয়। এমনকি আপনি নিজের দানব পিতা হিরণ্যকশিপুকে ক্ষমা করে দেওয়ার কৃপা পর্যন্ত প্রভুর কাছ থেকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভগবৎ সেবার পথে সব ধরনের বাধা-বিপত্তি যেন এই দাসীর দূর হয় এবং তার আত্মার কলুষতা যাতে নাশ হয় সেজন্য দয়া করে আপনার প্রভুকে কৃপা করতে বলুন। আমাকে প্রকৃত শান্তির পথ দেখান।'' এই প্রার্থনা জানিয়ে যখন আমি প্রভু নৃসিংহদেবের সৌন্দর্য এবং কৃপা সম্পর্কে ধ্যান করছিলাম, 'তখন এক গভীর অথচ সুমিষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম'—''আমি আমার চোখ ফেরৎ চাই'', প্রথমে বিষয়টি অগ্রাহ্য করি এবং নিজের মনকে প্রার্থনায় নিয়োজিত রাখতে সচেষ্ট হই। কিন্তু দ্বিতীয়বার একই শব্দ আমার কানে ভেসে আসে, ''আমি আমার চোখ ফেরৎ চাই''—এই স্পষ্ট নির্দেশনা শুনেও আমি পুনরায় এতে গুরুত্ব আরোপ না করায় পরমুহূর্তেই আমার হৃদয়ে এক ধরনের জ্বালা এবং ব্যথা অনুভব করতে থাকি। এ অবস্থায় করণীয় কী সে সম্পর্কে আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ি। এরপর শুনতে পেলামঃ ''পুজারীর কাছে যাও।'' আমি চিন্তা করলাম, আচ্ছা পূজারীর কাছে যাব এবং এ সম্পর্কে তাঁকে সব কিছু বলবো। কারণ এতে আমার হারানোর কিছু তো নেই। যদি পূজারী ভাবে আমি উন্মাদ, তাতে বড় জোর আমার অহমিকা কিছু কমবে বই কি!

ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে তখন বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাই, যাতে আমি তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারি। প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে অতিদ্রুত আমি পূজারী কক্ষে উপস্থিত হই। সেখানে আমি শ্রীপাদ জননিবাস প্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে দেখি। এ কক্ষের পরিবেশ তখন ছিল অতি পবিত্র এবং অপ্রাকৃত ধরনের। আমি সেখানে কয়েক

মিনিট দাঁড়িয়ে থাকি এবং আমার উপস্থিতি যাতে তাঁর নজরে পড়ে সেজন্য অপেক্ষা করতে থাকি। এরপর আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। তিনি আমাকে শ্রীনৃসিংহদেবের মূল পূজারী পঙ্কজাঙ্ঘ্রি প্রভুর কাছে যেতে বললেন।

যেভাবেই হোক আমি বুঝতে পারলাম যে, এই পর্যায়ে আমার এর চেয়ে বেশী কিছু করার নেই এবং করাও উচিত হবে না। পরদিন আমি আবার নৃসিংহদেবের সামনে উপস্থিত হলাম। সেই সময় আমার মনে সন্দেহ জাগল, তবে কি গত ছয় সপ্তাহ ধরে আমার চোখের যে ব্যাথা এবং দৃষ্টিশক্তি কমে আসছিল তা দূর করার জন্যই প্রভু—ঐভাবে আদেশ করছিলেন? এভাবে চিন্তা করে আমি এর উত্তরের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাই। তখন একই শব্দ শুনতে পেলাম। তবে আগের চেয়ে আরও দৃঢ় স্বরেঃ ''যখন আমারটা পাব তখন তুমিও তোমার চোখ ফিরে পাবে।'' আমি প্রভুর দিকে তাকালাম। তাঁর চেহারা থেকে মৃদু দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে। এই দেখে আমার হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে গেল।

পরদিন সকাল ২টা ২০ মিনিটে অতি তৃপ্তমনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার জন্য এই অবস্থা ছিল অপ্রত্যাশিত কারণ সাধারণত সকাল ৬টায় আমি ঘুম থেকে উঠি, মনে হল একটা কোমল স্বর যেন আমাকে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে মঙ্গল আরতিতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। সে অনুযায়ী আমি উক্ত আরতিতে অংশগ্রহণ করি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সেই একই স্বর যেন আমাকে নৃসিংহদেবের বেদী থেকে পূজারী কক্ষে যাওয়ার জন্য পঙ্কজাঙ্ঘ্রি প্রভুকে অনুসরণের তাগাদা দিল। আমি খুবই বিব্রত বোধ করলাম এবং এই সময় আমার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো।

পঙ্কজাঙ্ঘ্রি প্রভু শ্রীনৃসিংহদেবের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তখন তৈরী করছিলেন। আমি এই সময় কথা বলা আরম্ভ করলাম। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার গল্প শুনলেন। তারপর কিছু না বলে হাসলেন এবং আমাকে প্রভু নৃসিংহদেবের থালা থেকে কিছু মিষ্টি প্রসাদ দিলেন।

পরদিন সকালে আমার মেয়ে মন্দির থেকে যখন ফিরে আসে তখন চিৎকার করে বললঃ ''মাম্মি, তারা নৃসিংহদেবের চোখ পরিবর্তন করেছে, এখন তাঁর সুন্দর লাল রংয়ের চোখ হয়েছে।'' এর তিনদিনের মধ্যেই আমার চোখের দৃষ্টি আশ্চর্যজনকভাবে ভাল হয়ে যায়। সবই নৃসিংহদেবের কৃপা, কারণ সেই গভীর অথচ মধুর শব্দ যে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল! শ্রীমায়াপুরের কৃপালু প্রভু শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয় হোক, জয় হোক!

—অনুবাদকঃ শ্রীমনোরঞ্জন দে।

মহাভয়ঙ্কর রূপে শ্রীনৃসিংহদেব

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীমহানৃসিংহায় দংষ্ট্রাকরালবদনায় ঘোররূপায় বজ্রনখায় জ্বালামালিনে মম বিঘ্নান্ পচ পচ মম ভয়ান্ ভিন্দি ভিন্দি মম শত্রু(ন্ বিদ্রবয় বিদ্রবয় মম সর্বারিষ্টান্ প্রভঞ্জয় প্রভঞ্জয় ছট ছট, হন হন, ছিন্দি ছিন্দি মম সর্বাভিষ্টান্ পূরয় পূরয় মাম্ র(র(হুম্ ফট্ স্বাহা।

'' করাল দন্ত সমন্বিত ঘোররূপী বজ্রনখ বিশিষ্ট ভগবান মহানৃসিংহদেব আপনি আমার বিঘ্ন সমূহকে বিনাশ ক(ন, আমার ভয়কে বিদূরিত ক(ন, আমার শত্রুগণকে ধ্বংস ক(ন। আমার সমস্ত অমঙ্গল সর্বতোভাবে বিনাশ ক(ন। ছেদ ক(ন! ছেদ ক(ন! হত্যা ক(ন-হত্যা ক(ন, আমার সমস্ত অভিষ্ট পূর্ণ ক(ন, পূর্ণ ক(ন, আমাকে র(া ক(ন, র(া ক(ন।''

নৃসিংহদেবের এই মহামন্ত্র ভয়ঙ্কর— তাই না? বিশেষ করে মঙ্গলারতির সময় যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার থাকে, তখন যাঁরা মায়াপুরের শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেছেন তাঁরা নিশ্চয় ল(্য করেছেন, তাঁর মন্দিরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ভয়ঙ্কর রূপ প্রকশিত হয়। তাতে ২০০টি তৈল প্রদীপের আলোয় তিনি উদ্ভাসিত হন। তখন তাঁর চোখ এবং দাঁতগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সিংহের মতো উন্মুক্ত(মুখগহ্বর দর্শন করা যায়। আপনারা নিশ্চয় জানেন এই বর্ণনা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়।

গর্ভমন্দিরে পূজারী বিশাল একটি কর্পূর এবং একটি ঘি-এর জ্বলন্ত প্রদীপ দিয়ে আরতি করেন। বাইরে অনেক ভক্ত(তা দর্শনের জন্য ভীড় করে থাকেন, যেহেতু তাঁরা জানেন, এই মঙ্গল আরতি আর মাত্র তিন চার মিনিটের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

কেবলই সকাল ৫টা বেজেছে। আরতি শেষ হলে শ্রীনৃসিংহদেবের বেদীর শক্ত(কাঠের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি গর্ভ মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে শ্রীল প্রভুপাদের এবং সমবেত ভক্ত(বৃন্দের আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা জানাই। ভগবানের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করি ''হে কেশব, হে জগৎপতি, হে অর্ধনর অর্ধসিংহ রূপধারী শ্রীহরি, আপনার জয় হোক! ঠিক যেমন নখের দ্বারা একটি বোলতাকে মেরে ফেলা যায়, তেমনি ভাবে আপনি বোলতার মতো হিরণ্যকশিপুরূপধারী অসুরকে বিনাশ করেছেন। তাকে আপনি আপনার অপূর্ব সুন্দর করকমলের শক্ত(নখের দ্বারা বিদীর্ণ করেছেন।''

মেঝে পরিষ্কার করে কুশাসনে উপবিষ্ট হয়ে পূজা শু(হয় .... প্রথমে আমি ব্যবহার্য উপকরণগুলি এবং সেই সঙ্গে আমার দেহ ও মনকে পবিত্র করি। তারপর আমি আমার পারমার্থিক পরিচয়ের বিষয়ে ধ্যান করি, যা হচ্ছে আমি এই দেহ থেকে ভিন্ন এবং আমি ভগবানের নিত্য দাসানুদাস। তারপর আমার গু(দেব শ্রীল প্রভুপাদকে চন্দন, পুষ্প, ধূপ,

দীপ এবং কিছু নৈবেদ্য অর্পণ করে পূজা করি। তারপর ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চনায় তাঁকে সহায়তা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি।

ভগবান নৃসিংহদেবের নিকট জলের মাধ্যমে— মন্ত্র দ্বারা ষোড়শ উপচার অর্পণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীপ্র(াদ মহারাজকে একই ভাবে আরাধনা করি।

আমি শ্রীপ্র(াদ মহারাজের শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্মে আমার মস্তক, স্পর্শ করে তাঁর আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করি ঃ পরমে(্বর ভগবান কেবল মাত্র আপনার আসুরিক পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক আপনার প্রতি প্রদত্ত ক্লেশ নিবারণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে প্র(াদ মহারাজ আপনি হচ্ছেন ভগবৎ ভক্তি(র মহান আচার্য, দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। আপনি কৃপা করে এই জ্ঞান দান ক(ন যাতে আমি পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করতে পারি।

শ্রীনৃসিংহদেবের বেদীতে ৬০খানা শালগ্রাম শিলা রয়েছেন। অভিষেক করার জন্য আমি তাঁদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসি। মাঝখানের বড় শিলাটি হচ্ছেন নৃসিংহ শালগ্রাম, তাঁর মস্তকে চুড়া রয়েছে, শাস্ত্রে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্মে মস্তক স্পর্শ করানোর বিধান থাকলেও তা সর্ব্বদা ব্যবহারিক অথবা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা ভক্ত(দের মস্তকে সাতারি স্পর্শ করাই, কেননা টোপরের মতো ঐ বস্তুটির উপর শ্রীবিগ্রহের পাদুকাদ্বয় সংযুক্ত(রয়েছে। পূজারী হওয়ায় আমরা একটি বিশেষ সুবিধা লাভ করে থাকি, সেটি হচ্ছে ভগবানের পাদপদ্মে আমরা সরাসরি মস্তক স্পর্শ করতে পারি। ভগবানের কোন অসুবিধা যাতে না হয়, সেই ভেবে তাঁর নিকট আশীর্বাদ এবং (মা ভি(া করে ভগবানের পোশাক খুলে দিয়ে ভেজা নরম তোয়ালে দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিই। আমি যখন খস বা চন্দনের সুগন্ধি তেল দিয়ে তাঁকে মালিশ করি, তখন তাঁর শরীর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর রূপ অপূর্ব, হাল্কা এবং সুন্দরভাবে গঠিত, তাঁকে তেজস্বী অথচ কৃপালু বলে মনে হয়। তাঁর জানুদ্বয় বাঁকানো, লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাঁর কোমরে রয়েছে কোমর বন্ধ, যার বন্ধনের নিকটে রয়েছে একটি সিংহের মুখ, তাঁর চোয়াল দুটি বড় এবং মাঝখানে জিহ্বা রয়েছে—আমিও জানিনা সেটি কার। তাঁর নাভিদেশ গম্ভীর এবং ব(দেশ প্রশস্ত, ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের দিব্য শরীর মসৃন, স্পর্শ করলে কোমল এবং অত্যন্ত নয়ন রঞ্জন। তাঁর হস্তে রয়েছে বলয় এবং অন্যান্য অলংকার। তিনি অষ্টভূজ সমন্বিত, তার মধ্যে সামনের দুটি হাত ব্রহ্মার প্রতিশ্রুতি র(ার জন্য রয়েছে উন্মুক্ত(, তাতে কোন অস্ত্র নেই। তাঁর আর ছয়টি হাতে রয়েছে, তলোয়ার, পদ্ম, চত্র(, শঙ্খ, গদা এবং ঢাল।

ভগবান তাঁর ভক্তে(র প্রতি অবহেলা কখনও সহ্য করতে পারেন না। বলা হয়, 'মুখ দেখে মনের খবর জানা যায়'। তা যদি সত্য হয়, তবে দেখতে পারব অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে আত্র(মণ করার জন্য তিনি যখন স্তম্ভ থেকে নির্গত হয়েছিলেন, তখন তিনি কত ভয়ঙ্কর ছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত(প্র(াদকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

"শ্রীনৃসিংহদেবের চক্ষুদ্বয় গলিত স্বর্ণের মতো। তাঁর উজ্জ্বল কেশরগুলি ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলের পরিধি বর্ধিত করেছে। তাঁর ভয়ানক দন্তপংক্তি এবং ধারালো জিহ্বা নাড়ানো দেখে মনে হয় যেন দুটি তলোয়ার যুদ্ধ করছে। তাঁর কর্ণদ্বয় দণ্ডায়মান ও নিশ্চল। তাঁর নাসিকা বিবর এবং মুখগহ্বর দেখে মনে হচ্ছিল পর্বতের গুহা। তাঁর চোয়াল দুটি ভয়ঙ্কর ভাবে বিস্ফারিত এবং তাঁর বিরাট শরীর গগন স্পর্শ করছিল।"

ভক্তদের এবং মন্দিরের সুরক্ষার জন্য যখন নৃসিংহদেবের শ্রীবিগ্রহ আনার কথা হয়েছিল তখন শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আলোচনা করতে মন্দিরের পরিচালকগণ তিন জন প্রধান পূজারীকে ডেকেছিলেন। যখন তাঁর প্রাত্যহিক পূজা কে সম্পাদন করবে সেই প্রশ্ন এল তখন কিন্তু কেউ এগোতে চাননি। "দীর্ঘকাল অপেক্ষা করারপর অবশেষে যখন শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত, তখন কেউ তাঁর পূজা করতে চাইছেন না! উনাদের এরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক, আমাকে বলা হল .... "তুমি কেন তাঁর পূজা করতে চাইছে না?" আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম—"আমি খুব ভয় পাচ্ছি"। উনারা আমাকে বললেন—"তাহলে তুমি কি চারটে বিধি-নিষেধ পালন কর না? ..... অবশ্যই করি, তবে ......"

সৌভাগ্যক্রমে, আত্মতত্ত্ব প্রভু আমাদের ভয় ভেঙ্গে দেন, তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে এই শ্রীবিগ্রহ এনেছিলেন। তিনি আমাদের বললেন যে, নৃসিংহদেবের এই স্থানু (যখন নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য স্তম্ভ থেকে ভয়ঙ্কর রূপে কেবলই নির্গত হয়েছেন) রূপ কেউ উপাসনা করে না, সেই জন্য এমনকি সেই স্থপতি শিল্পিও এই বিগ্রহ বানাতে প্রথমত রাজী হননি। সাধারণত মানুষ ভগবানের নিকট যায় কিছু আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে, কিন্তু যখন তিনি ক্রোধে কম্পমান তখন তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করা—ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না। কোনও শান্ত বিগ্রহের নিকট যাওয়াই বরং ভাল হবে অর্থাৎ তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর। কিন্তু পরে, স্থপতি যখন জানতে পারলেন যে, এই বিগ্রহ মায়াপুর ধামের জন্য, তখন তিনি রাজী হন, কারণ যে কোন বিগ্রহকে ধামে আনলে, তিনি ধামের অধিষ্ঠাতার ভাব ধারণ করেন। এই ক্ষেত্রে এটি ওদার্য, "উদারতা" যা হচ্ছে শ্রীগৌরহরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভাব।

ভয়ঙ্কর হলেও সিংহী তার শাবকের প্রতি খুব কৃপাময়ী। তেমনই, হিরণ্যকশিপুর মতো অভক্তের প্রতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হলেও শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদের মতো তাঁর প্রিয় ভক্তদের নিকট অত্যন্ত ভদ্র এবং করুণাময়।

ভগবানকে পোষাক পরাতে পরাতে তাঁর করুণার কথা স্মরণ করে ভাবছিলাম, কীভাবে মানুষ আমাদের নৃসিংহদেবের পূজা করার উদ্দেশ্যকে ভুল বোঝে। সময় সময় ভক্তরা বলেন, নৃসিংহদেবের পূজা করা হচ্ছে 'বৈকুণ্ঠভাব', সেই আরাধনা নাকি ভগবানের অন্তরঙ্গ ধাম গোলোক বৃন্দাবনে আমাদেরকে উপনীত করবে না। কিন্তু ভগবান নৃসিংহদেব বিশেষ ভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভক্তদের প্রতিই আগ্রহী। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের ভক্তিমার্গের বিঘ্নসমূহ দূর করে আমাদের সঙ্গে আদান প্রদান করার জন্য তিনি বিশেষত এই রূপে

আবির্ভূত হন। কেউ যদি প্রেমানন্দে বাহু তুলে নিতাইগৌর আর রাধামাধবের নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে পারেন, তা খুবই ভাল। কিন্তু আপনার হৃদয়ে যদি এমন কিছু থাকে, যা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উচ্চারণ করার ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তাহলে বিনীত ভাবে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট গমন করে, তাঁর নিকট প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাঁর ধারালো নখ দিয়ে আপনার হৃদয়ের কুটিল বাসনাগুলিকে বার করে এনে দূরে নিক্ষেপ করেন ..... এটিই তো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন, "অতএব আমার হৃদয়কে পবিত্র করে কৃষ্ণসেবার বাসনা লাভ করার জন্য আমি ভগবান নৃসিংহদেবের চরণে প্রার্থনা জানাব। আমি যাতে অনর্থ মুক্ত হয়ে নবদ্বীপ ধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করতে পারি, তার জন্য ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানাব।" তিনি আরও প্রার্থনা করলেন, "সেই সময়ে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় আমার শরীরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমানন্দের লক্ষণ সমূহ ফুটে উঠবে, আর তখন আমি শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরের দোরগোড়ায় ভূমিতে গড়াগড়ি দেব।"

যখন শ্রীবাস ঠাকুর দরজা বন্ধ করে ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করছিলেন, তখন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি তাঁর মহাপ্রকাশ প্রদর্শন করেননি? তিনি বলেছিলেন, "শ্রীবাস, তুমি কি জান না, তুমি দরজা বন্ধ করে যাঁর উপাসনা করছ, আমিই সেই ব্যক্তি?" আর অদ্বৈত আচার্য, যিনি উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে গঙ্গাজল-তুলসী দিয়ে শালগ্রাম শিলার আরাধনা করে ভগবানকে অবতীর্ণ করিয়েছিলেন? কথিত আছে, তিনি নৃসিংহ শালগ্রাম শিলার আরাধনা করেছিলেন।

এবার আমি ভগবানের অঙ্গে অলঙ্কার পরাতে শুরু করি। আমি নৃসিংহদেবের মালাগুলি সাজিয়ে নিই, যাতে সেগুলি পাশাপাশি থাকে, তাঁর কাব্জিতে বলয়গুলি পরিয়ে দিই, তাঁর সুন্দর অঙ্গুলিগুলিতে অঙ্গুরী পরিয়ে দিই। " হে ভগবান আমি আপনার খুবই নিকটে, তবুও আমি কত দূরে। আমি কবে ভক্ত হব? আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রহ্লাদ আপনার ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল, জিহ্বা, আপনার সূর্যের মতো উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়, আপনার বিস্ফারিত ভ্রূযুগল, এসব কোন কিছুতেই ভয় পান না। তিনি আপনার ধারালো সুঁচালো দন্তরাজিকে, আপনার নাড়ি ভুঁড়ির মালা এবং আপনার রক্তাক্ত কেশররাজিকে ভয় পান না। আবার আপনার ভয়ঙ্কর গর্জন, যার ভয়ে হস্তী সমূহ পলায়ন করে, অথবা আপনার শত্রু নিধনকারী হস্তের নখনিচয়কেও ভয় পান না। কিন্তু তিনি বলেন "আমি এই জড় জগতের বদ্ধ জীবনকে অত্যন্ত ভয় পাই। কবে সেই মুহূর্ত আসবে যখন আপনি আমাকে আপনার পাদপদ্মের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করার জন্য আহ্বান করবেন?" আমি জানি, শ্রীপ্রহ্লাদ সেই শেষ মুহূর্তটির কথা বলেছিলেন আমাদের কল্যাণের জন্য, কেননা তিনি সর্বদাই আপনার নিকট সম্পূর্ণরূপে শরণাগত।

একবার আমি আপনার নিকট শরণাগত হয়েছিলাম—কমপক্ষে কয়েক মিনিটের জন্য। সেটি ঘটেছিল ১৯৮৭ সালের বন্যার মধ্যে। যখন কোমর জলে দাঁড়িয়ে মন্দিরের মধ্যে

আমি আপনার পূজা করছিলাম, একটি বিশাল, ভয়ঙ্কর সাপ মন্দিরের মধ্যে সাঁতরে এসে আপনার পিছন দিকে গিয়ে আমার ঠিক পাঁচ ফুট সামনে দাঁড়িয়ে যায়, সেও অবশ্য বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা পাচ্ছিল না। আমাকে বেশ কয়েক মুহূর্ত পরীক্ষা করার পর সে ঘোলা গঙ্গাজলে ডুবমেরে হারিয়ে গেল। আমি তখন প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে, লক্ষ্য করলাম আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে। তখন নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনও অস্ত্র নেই, সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ারও ক্ষমতা ছিল না। আমি ভীষণ বিপন্ন বোধ করলাম। এইরূপ অসহায় অবস্থায় হে ভগবান, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম, কেননা আমি জানতাম যে, আমার ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে। '' আপনি হচ্ছেন প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত পরমাত্মা, আপনি যদি চান ঐ সাপটি আমাকে কামড়াক, তবে সে কামড়ে দেবে—আর আপনি যদি না চান, সে কামড়াবে না। আমি আমার সেবা করে চলি! ফল সর্বদা আপনার হাতে।'' তার পর আমি পুনরায় আপনার আশ্রয়ের নিরাপত্তা অনুভব করে শান্ত হই। আমি সকালের পূজা সম্পন্ন করলাম, কিন্তু সেই ঘটনাটির চিন্তা আমার মন থেকে যাচ্ছিল না। তাতে আমার মনে হয়েছিল কপিলদেবের বর্ণনা অনুসারে, একটি শিশু তার মাতৃগর্ভে থাকার কথা। তাদের অসহায় এবং যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় তারা হৃদয়স্থ পরমাত্মার দর্শন পায়, তারা যদি পুণ্যবান হয়, তারা প্রার্থনা করে যে, ভগবান যদি তাদের এই কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন, তাহলে তারা—মাতৃগর্ভে থেকে উদ্ধার পেয়ে—ঐকান্তিক ভাবে তাঁর আরাধনা করবে। কিন্তু যেই মাত্র তারা উদ্ধার লাভ করে এবং ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সবকিছু ভুলে যায়। তবুও, আমার বড় আশা যে, আমি একদিন আপনার প্রীতিবিধানের জন্য সুন্দরভাবে সেবা করতে পারবো। হ্যাঁ, আর একটি কথা, মন্দির কক্ষটি যতদিন বন্যার জলে প্লাবিতছিল, সেই সাপটি প্রতিদিন এসে বিগ্রহকে একবার করে প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে যেত। কে জানে বাস্তবে সেই সাপটি কে?

শ্রীনৃসিংহদেবের শরীর টাট্‌কা পুষ্প এবং তুলসী মালায় আবৃত করে চন্দন লেপন করি এবং তার সঙ্গে তাঁর শ্রীচরণে সুগন্ধি পুষ্প ও তুলসী অর্পণ করি (যা হচ্ছে ভগবানের নিকট সমস্ত কিছু সমর্পণ করার প্রতীক)। এবার প্রাতঃকালীন পূজা সম্পূর্ণ হল।

বাইরে ভক্তরা সমবেত হয়েছেন, তা শুনতে পেয়ে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। দর্শনের সময় হয়ে গেছে। আমি তিনবার শঙ্খধ্বনি করে নৃসিংহদেবের অপূর্ব দর্শনের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করলাম। জয় শ্রীপ্রহ্লাদ-নৃসিংহদেব! ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গ প্রাণিপাত করেন এবং তাঁদের উগ্রনৃসিংহদেবকে পুনরায় দর্শন করে আনন্দিত হন, কেননা তাঁরা জানেন যে, নৃসিংহদেব দেখতে যতটা উগ্র, বাস্তবে তিনি তা নন।

(১৯৯৪ সালে প্রকাশিত মায়াপুর জার্নাল থেকে গৃহীত।)

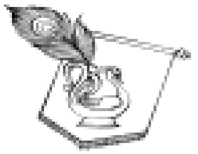

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের সাম্প্রতিক লীলা সংগ্রহ

প্রথম লীলা ঃ—

শ্রীনৃসিংহদেব যখন শ্রীধাম মায়াপুরে প্রথম এলেন, তখন নৃসিংহদেবের পূজারী শ্রীপঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, তৎকালীন মায়াপুর মন্দিরের পরিচালক তাঁকে কিছু ডিজেল আনতে বলছেন। তিনি বললেন, ''ডিজেল দিয়ে তিনি একটি যজ্ঞ করবেন আর তাতে নৃসিংহদেবকে আহুতি দেওয়া হবে।'' উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করতে পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু পারলেন না, তাই তিনি কিছু ডিজেল নিয়ে এসে তাঁকে দিয়ে বললেন, ''এবার আপনি যা খুশি তাই করুন, আমি কিছুই করতে পারব না।''

কিছুক্ষণ পরে পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু ফিরে এসে দেখলেন, নৃসিংহদেব পুড়ে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছেন। কেবল মাত্র তাঁর চরণ দুখানা বাকি রয়েছে। এই অবস্থা দেখে শোকে দুঃখে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

এমতাবস্থায় তাঁর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। এই ঘটনা তিনি তাঁর দাদা জননিবাস প্রভুর নিকট বর্ণনা করলেন। জননিবাস প্রভু তা শ্রবণ করে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে বললেন, ''ও হ্যাঁ, গতকাল থেকে আমাদের শালগ্রামে জলদান শুরু হয়েছে (এক মাসের জন্য শালগ্রাম ও তুলসীর উপর জলের ধারা বাঁধা), আমরা কেউ তো তা করিনি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ভগবান নৃসিংহদেব আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে আমরা সত্বর নৃসিংহদেব শালগ্রামে জলদান শুরু করি।

দ্বিতীয় লীলা ঃ—

একবার প্রতিদিনের মতো সেদিনও নৃসিংহদেবের পূজা চলছিল। পূজারী লক্ষ্য করলেন যে, নৃসিংহদেবের গলার মালা থেকে একটি ফুল খসে পড়ল। এই দেখে পূজারী দর্শনার্থীদের জিজ্ঞাসা করলেন—''আপনারা কেউ কি নৃসিংহদেবের নিকট বিশেষ কোনও প্রার্থনা করছেন?'' সামনের দিকের দর্শনার্থীরা কেউ কিছু বললেন না, কিন্তু পিছনের দিক থেকে এক মহিলা অশ্রুসজল চক্ষে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, ''আমার একমাত্র মেয়ের চার-পাঁচ বছর হল বিবাহ হয়েছে কিন্তু তার কোনও সন্তানাদি হয়নি। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এটিকে অশুভ বলে মনে করছেন। তাই আমি নৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করছিলাম যে, তিনি যদি তাকে এই অসহায় অবস্থায় সাহায্য করেন।'' পূজারী তাঁকে বললেন, ''আপনার প্রার্থনা নৃসিংদেব মঞ্জুর করেছেন। তার প্রমাণ হচ্ছে, তাঁর গলার মালা থেকে এই ফুলটি

খসে পড়েছে। এটি নিয়ে যান, ভাল করে রাখবেন। আপনি এই ফুল ধুয়ে সেই জল আপনার মেয়েকে পান করাবেন।'' তার পর সেই মাতাজী চলে যান, আর পূজারীরাও সেই কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

এক বছর পর সেই মহিলা তাঁর মেয়ে-জামাই এবং নবজাত শিশু-পুত্রকে নিয়ে হাসি মুখে নৃসিংহদেবের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি পূজারীকে তাঁর আগের বছরের প্রার্থনা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, ''শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় আমার মেয়ের এই পুত্র-সন্তান লাভ হয়েছে। আমরা তার নাম দিয়েছি— 'প্রহ্লাদ'। এই বলে তাঁরা সকলে মিলে পুনরায় শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের নিকট খুব ভালভাবে পূজা দিলেন।

তৃতীয় লীলা ঃ—

আমাদের নামহট্টের ভক্ত মহিলা কল্যাণী দাসীর দুই মেয়ে। বড়টির নাম প্রতিভা আর ছোটটির নাম অনুভা। উভয়েরই বিবাহ হয়েছে। এখন তাঁদের প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানাদি রয়েছে। তাঁরা উভয়েই একই শহরে অর্থাৎ বহরমপুরে থাকেন। একবার প্রতিভার স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে থাকেন। অন্যান্য সমস্ত আত্মীয়দের সঙ্গে ছোট বোন অনুভাও তাঁর জামাইবাবুর এই অবস্থার দর্শনে অত্যন্ত উদ্বেগে ছিলেন। তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ভক্ত তাই তিনি (ইস্কন শ্রীমায়াপুরের) নৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করতে থাকেন তাঁর জামাইবাবুর সুস্থতার জন্য। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাত্রে বাড়িতে ফিরে আসেন। শেষ রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন নৃসিংহদেব তাঁর নিকটে এসে বলছেন—''তুমি দুশ্চিন্তা করো না। তোমার জামাইবাবু ভাল হয়ে যাবেন।'' ইতিমধ্যে তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সেদিন সকালবেলায় হাসপাতাল থেকে খবর এলো যে, রোগী ভাল আছেন, তাঁর স্যালাইন এবং অক্সিজেন দুটোই খুলে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি এখন কথা বলছেন।

চতুর্থ লীলা ঃ—

এক গ্রামে মারামারি হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে একজনের মুখে অ্যাসিড্ ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। ফলে তাঁর চোখ-মুখ সবই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর অন্যটির মাত্র ১০ শতাংশ ভালো ছিল। ডাক্তারেরা বলেছিলেন, যে চোখটির ১০ শতাংশ ভাল আছে সেটিও দুই-একদিনে নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁরা পরামর্শ দিয়েছিলেন রোগীকে নিয়ে ভেলোরে (দক্ষিণ ভারত) নিয়ে যেতে। সেখানকার ডাক্তারেরা যদি এর কোনও কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। ঐ সময় ওখানে একজন ভক্ত ছিলেন, তিনি তাঁদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, ''তোমরা নৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করতে পার। যাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। সেই সব লোকেরা শ্রীমায়াপুরের শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা

করেন। পরের দিন দেখা গেল রোগী বেশ পরিস্কার সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন আর ডাক্তারেরা তা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হলেন।

পঞ্চম লীলা ঃ—

এক রাশিয়ান মাতাজী শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য প্রতিদিন তুলসীমালা গাঁথতেন। তাঁর প্রতি খুশি হয়ে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজারী তাঁকে নৃসিংহদেবের হাতের কৃত্রিম নখ প্রসাদ হিসাবে দান করেছিলেন। সেই মাতাজী সেটি নিয়ে তাঁর বাড়িতে যান। সেই রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীনৃসিংহদেব এসে তাঁর বিছানায় বসলেন এবং তিনি তাঁর লম্বা আঙ্গুল সেই মহিলার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে একটি কালো রঙের পদার্থ বের করে এনে বললেন—''লক্ষ্য কর, এটি প্রেম নয়, কাম। এখনো আরও বাকি আছে। এটি আমি কী করব?'' সেই মাতাজী সেই সময় কোনও উত্তর দিতে পারেননি। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। পরের দিন তিনি নৃসিংহদেবের সামনে এসে তাঁকে বলেছিলেন যে, ওই বস্তুটি যেন তিনি অনেক দূরে ফেলে দেন।

ষষ্ঠ লীলা ঃ—

ইস্কন ইয়থ ফোরামের একটি ভক্ত শ্রীল তমাল কৃষ্ণ মহারাজের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর বাবার সঙ্গে তাঁর মাঝে মধ্যে তর্কাতর্কি হত। তাঁর বাবা বলেন, ''রাধা-মাধব থাকতে নৃসিংহদেবের পূজা করার কী দরকার ?'' ছেলেটি তাঁর বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং নৃসিংহদেব অভিন্ন। কিন্তু তাঁর বাবার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি বলতে চাইছিলেন যে, নৃসিংহদেব হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার। তবে ভিন্নভাবে নৃসিংহদেবের পূজা করার কী প্রয়োজন?

গত ২০০৩ সালের নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর দিন তাঁর বাবাকে নিয়ে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে এসেছিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের অভিষেকের সময় তাঁরা শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করছিলেন। ইতিমধ্যেই ছেলেটির বাবা লক্ষ্য করলেন যে, নৃসিংহদেবের মুখের জায়গায় মাধবের মুখ। তিনি রাধা-মাধবের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, তার পর পুনরায় শ্রীনৃসিংহদেবের দিকে লক্ষ্য করলে তিনি আবার শ্রীনৃসিংহদেবের মুখের পরিবর্তে শ্রীমাধবের মুখ দর্শন করলেন। এইভাবে তাঁর প্রায় ২০ সেকেন্ড মতো সময় অতিক্রান্ত হয়। এর পরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীনৃসিংহদেব এবং শ্রীমাধবের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

সপ্তম লীলা ঃ—

২০০৪ সালে, শ্রীল জয়পতাকা স্বামীর শিষ্যা দক্ষিণ কলকাতার কবিপ্রিয়া দেবীদাসী ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য ছয় গাছা বালা বানিয়েছিলেন। কোনও না কোন ভাবে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে আসতে এবং নৃসিংহদেবের হাতের বালাগুলি দিতে পারেননি। সে কথা

একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন।

মাতাজী ক্রমশ বিভিন্নভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েও উপশমের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে ডাক্তার বললেন—ওনার থাইরয়েড্ হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে তিনি অত্যন্ত মোটা হয়ে যাবেন এবং তাঁরপরে চলা ফেরা করাই একপ্রকার বন্ধ হয়ে যাবে। সেই কথা শুনে তাঁর মনে ভীষণ উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেল।

একদিন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, শ্রীনৃসিংহদেবের হাতের বালাগুলো তো দেওয়া হয়নি। তৎক্ষণাৎ তিনি সেগুলি নিয়ে সেই অসুস্থ শরীরেই তাঁর স্বামীর সঙ্গে মায়াপুরে আসেন এবং নৃসিংহদেবের বালাগুলি তাঁকে অর্পণ করে, এ ব্যাপারে দেরী হওয়ার জন্য তাঁর নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

সেদিন থেকে ঠিক তিন দিনের মধ্যেই তাঁর যাবতীয় ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেল। শ্রীনৃসিংহদেব ভগবান কি জয়!

অষ্টম লীলা ঃ—

২২ শে এপ্রিল ২০০৫, রচিতাম্বরা মাতাজীর নাতনী রেবতী সুন্দরী দেবী দাসী, বয়স ৮ বৎসর, ইস্কন মায়াপুরের গৃহস্থ পাড়ায় পার্কে খেলা করছিল। ওখানে বাঁশ দিয়ে তৈরী একটি ঘর ছিল। রেবতী ঐ ঘরের ছাদে উঠে খেলা করতে করতে হঠাৎ ছাদ ভেঙ্গে পড়ে যায়। পড়ার সময় তার মাথা নীচের দিকে ছিল, আর তার উপর ঐ ঘরের চালও ভেঙ্গে পড়ে। এই ভাবে চাপা পড়ে মেয়েটি অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে ভয়ে কাঁপতে আর কাঁদতে থাকে। ভীষণ ভাবে সে আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের গুরুকুলের হোমিও ডাক্তার গৌরবাবুর নিকট নিয়ে গেলে, ও যাতে আতঙ্ক মুক্ত হতে পারে, তার জন্য চিকিৎসা করেন এবং সেই সঙ্গে তিনি পরামর্শ দেন একটি স্ক্যান্ করানোর জন্য।

তিনদিন পর বেরতী রাত্রে জেগে উঠে কালো রক্ত বমি করতে থাকে। তাকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাস্তায় যাওয়ার সময় তার নাক দিয়ে জল বের হচ্ছিল। তার কিছুক্ষণ পরেই তার নাক দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। তাকে শিশু বিশেষজ্ঞের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারবাবু খুব সত্বর শহরের শ্রেষ্ঠ স্নায়ু বিশেষজ্ঞকে ডেকে নেন। সেই ডাক্তার তখন তার সি.টি. স্ক্যান করতে বলেন। তার ফলাফল দেখে তিনি আমাদেরকে আর একজন ভাল স্নায়ু বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ ডাক্তারের নিজস্ব হাসপাতালও রয়েছে। তখনই রেবতীকে ওখানে ভর্ত্তি করা হয়।

ঐ লক্ষণ সারা রাত্রি চলতে থাকল, ডাক্তাররা বললেন, ওর নাক দিয়ে যে লালা রেরোচ্ছে ওটা ওর মস্তিষ্ক থেকেই বেরিয়ে আসছে। স্ক্যানে ধরা পড়ল, ওর মস্তিষ্কের নীচের

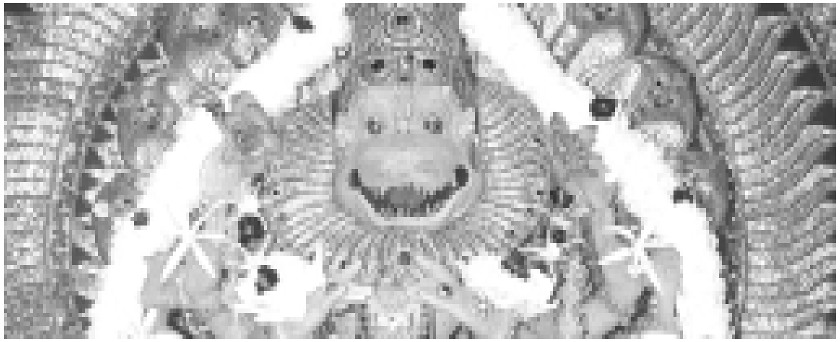

হাড়ে সামান্য ফাটল রয়েছে। তা থেকেই ঐ লালা বেরোচ্ছে। তার মস্তিষ্ক ফুলে গেছে, সেখানে রক্তও জমা হচ্ছে, আর তাতে চাপ সৃষ্টি করছে। সেই ঘটনার পর থেকে ওর মাথায় সব সময় যন্ত্রণা হচ্ছিল। দু'দিন ধরে চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কমে না। ওর চোখের সাদা অংশগুলি সম্পূর্ণ লাল হয়ে গিয়েছে, ও আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে পড়ছিল এবং সমস্ত দিকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিল। শেষে ডাক্তাররা বললেন, পরের দিন খুব ভোর বেলায় একটি বিশেষ ধরনের স্ক্যান করবেন যার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে তার মস্তিষ্কের কোন্ অংশে সত্যি সত্যি কী ধরনের আঘাত পেয়েছে এবং সেই অনুসারে তা নিরাময়ের জন্য কীভাবে অপারেশন করা যাবে সে বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত করবেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত পরের দিন সকাল ৯টায় আমাদের জানাবেন।

রচিতাম্বরা মাতাজী তখনই পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভুকে ফোন করে এই সমস্ত পরিস্থিতি জানান এবং তাঁকে অনুরোধ করেন শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট এ বিষয়ে প্রার্থনা করতে। পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু তখনই বলেন যে তিনি সকাল ৫টা থেকে ৭টার মধ্যে নৃসিংহদেবের অভিষেক সহ বিশেষ ভাবে পূজা অর্পণ করবেন। এই সময়েই রেবতীর সেই বিশেষ স্ক্যান হওয়ারও কথা ছিল।

পরের দিন সকালে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলে ডাক্তাররা অত্যন্ত চমৎকৃত হয়ে বললেন যে, নতুন ভাবে স্ক্যান করে দেখা গিয়েছে ঐ ক্ষত অলৌকিক ভাবে সেরে গেছে আর যত সমস্ত লক্ষণ যেমন যন্ত্রণা, ভীষণ ভাবে নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া, মস্তিষ্কের থেকে লালা ঝরা, বমি ইত্যাদি সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যখন রেবতীকে দেখতে গেলাম সে তখন তার বিছানায় বসে তরতাজা ভাবে তাকাচ্ছে তার চোখের সাদা অংশগুলিও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। নৃসিংহদেবকে ধন্যবাদ।

এই সমস্ত ঘটনায় রেবতী বলল, ''দিদা, পরের বারে যদি আমার এই ধরনের কিছু ঘটে, দয়াকরে তুমি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে সময়ের অপচয় করো না। আমাকে তোমরা সোজা ভগবান শ্রীনৃসিংহ দেবের কাছে নিয়ে যেও।''

ভগবান নৃসিংদেব এমনকি অভক্তকেও কৃপা করেন

তাইওয়ানের মহিলা ভক্ত যশোদা মাতার পালক পিতা গত ২ মাস আগে ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। তিনি যখন হাসপাতালে ছিলেন, তখন যশোদা মাতা একটি টেপ রেকর্ডারে সর্বক্ষণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র তাঁর নিকট বাজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পালক পিতা অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন এই শব্দব্রহ্মের সংগীত শ্রবণ করতে থাকলেন, তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠলেন, আর তাঁকে দেখে মনে হল, তিনি চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ঐ সংগীত উপভোগ করছেন। তিনি ঐ সংগীতের তালে তালে খাটের পাশের লোহার উপর আঙ্গুল দিয়ে বাজাতে লাগলেন। তাঁর হাতে আংটি ছিল, তাই তাতে টন্ টন্ শব্দ হতে থাকে। মনে হল, তিনি ঐ মন্ত্রের প্রতি পুরোপুরি মগ্ন হয়ে রয়েছেন। হঠাৎ তিনি বললেন,'' দেখ! একটা বিশালাকার পাঁচ থাবা (হাত) বিশিষ্ট মানুষ, তাঁর মথাটা ঠিক সিংহের মতো, তিনি তো আমার কক্ষের দিকে আসছেন। তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না? উনি আসছেন.........'' ঐ ব্যক্তি তখনও চোখ বন্ধ করেই রয়েছেন। তিনি বললেন,''ও, হ্যাঁ, আমি ভুলেই গেছি যে তোমরা কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না, উনি কিন্তু সত্যি সত্যিই এখানে রয়েছেন। আমি জানিনা তিনি কে।''

সেই সময় যশোদা মাতা আর তাঁর কন্যা আশ্চর্য হয়ে একে অপরের দিকে দেখতে দেখতে তাঁকে উত্তর দিলেন,'' বাবা, উনি নৃসিংহদেব।'' উনি বললেন,'' কী দেব???, আমি উনাকে চিনি না। কিন্তু উনি মাথা নেড়ে নেড়ে আমাকে বলছেন, হ্যাঁ, তিনিই সেই।'' যশোদা মাতার তো সেই কথা শুনে ভীষণ আনন্দ হল। তিনি তাঁর বাড়ীতে মায়াপুরের শ্রীনৃসিংহদেবের একখানা বড় ছবি রেখেছেন, আর প্রতিদিন তিনি ঐকান্তিকভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা করেন, যাতে তাঁর পালক পিতা মৃত্যুর সময় আসক্তিশূন্য হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দেহত্যাগ করেন, যাতে পরবর্তী জন্মে তিনি ভক্ত হতে পারেন।

তাঁর বাবা বলেই চললেন, ''দেখ, উনি আমার প্রতি মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমার সঙ্গে আবার কথা বলছেন....... ওঃ, উনি বলছেন, তোমরা যা গাইছ, আমাকেও সেই গানটি শিখতে হবে........ তোমরা আসলে কী গাইছ?''

যশোদা মাতা বললেন,''ভগবানকে ডাকার জন্য এটি একটি মন্ত্র।'' তিনি বললেন,'' আমি জানি না কী মন্ত্র, তবে আমাকে শিখিয়ে দাও।''

''ঠিক আছে বাবা, ভালভাবে শোনো, আর আমাদের পরে পরে বলো...... হরে কৃষ্ণ,

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।'' যশোদা মাতা ধৈর্যসহকারে তাঁকে মন্ত্রটি শেখালেন। তিনি শীঘ্রই ঐ মন্ত্র জপ করতে চেষ্টা করলেন,...... আর ভালই জপ করতে লাগলেন।

পরের দিন তিনি শান্তভাবে দেহত্যাগ করলেন।

আমরা ভক্তরা তারপর যশোদা মাতার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্য একটি সভার আয়োজন করি। যশোদা মাতা প্রসাদ, চন্দন, মালা, গঙ্গাজল, তুলসী ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর গুরুমহারাজ শ্রীল গিরিধারী স্বামী তাঁকে ফোনের মাধ্যমে কী কী করতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যশোদা মাতার পিতাকে দেখে মনে হচ্ছিল শান্ত, তাঁর গালগুলি ছিল ঈষৎ গোলাপী। তাঁর শরীর ছিল কোমল। সেই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার পর তাঁর দেহ দাহ করার জন্য চুল্লিতে পাঠানো হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে যে সমস্ত লোকেরা দাহ করছিল, ওরা আমাদের নিকট এসে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলছে ''তোমার বাবার ভস্ম দেখতে এত ভাল লাগছে, আমরা কখনও এমন সুন্দর সাদা ভস্ম দেখিনি, যেন দামী জেড্ পাথরের রং। ওঁর কী হয়েছিল? ওঁর জন্য তোমরা কী উচ্চারণ করছ? আমাদেরকে ওটা লিখে দেবে? আমরাও শিখব, আমরা ভাবছি আমাদের কাজ করার সময় আমরাও ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করব।''

ভগবান একজন অভক্তের প্রতিও কৃপালু— এই শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ প্রদর্শিত হল। বলা হয়েছে— ''কেউ যদি সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে ব্রতী থাকেন, তবে তাঁর পরিবারের সকলেও লাভবান হন।''

ভক্ত লীন, তুলিপ, তাইওয়ান।
২০ শে মার্চ ২০০৬।

পিতার মানসিক দ্বন্দ্ব নিরসন করলেন শ্রীনৃসিংহদেব।

৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬

আমার পিতা-মাতা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। তাঁরা গৌড়ীয় মঠ থেকে দী(ত ভক্ত(। আমার নাম গৌরাঙ্গ। ছয়মাস পূর্বে আমি ইস্কন মায়াপুরে যোগদান করে নতুন ভক্ত(প্রশি(ণ বিভাগ থেকে তিনমাসের জন্য প্রশি(ণ পাওয়ার পর, আমি এখন বিদ্যালয় প্রচার বিভাগে সেবা করছি।

গত ঝুলন পূর্ণিমার মাত্র কয়েকদিন পূবে, আমার পিতা আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মায়াপুরে আসেন। ওরা চান আমি যেন উচ্চমাধ্যমিক পরী(া দিয়ে যোগ্যাতা অর্জন করি। আমার মনেও মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটু ইচ্ছা ছিল। আমার বাবার উদ্দেশ্য জানতে পেরে, আমার শুভাকাঙ(ী ভক্ত(রা আমার পিতাকে অনুরোধ জানালেন যে, তিনি যেন আমায় মায়ার জগতে পুনরায় না নিয়ে যান। তার জন্য একজন ভক্ত(তো তাঁর নিকট একান্তই প্রার্থন করতে লাগলেন।

আমার পিতা বৈষ(ব, তাই তিনি এমতাবস্থায় এক বিষম পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন। অবশেষে তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের চরণাশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর নিকট সহায়তার জন্য প্রার্থনা করেন। সেই রাত্রে স্বপ্নে শ্রীনৃসিংহদেব আমার পিতার নিকট আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন শান্ত। তিনি আমার পিতার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলেন, ''প্রিয় পুত্র, তুমি যাও, তোমার সন্তান এখানে আমার চরণে থাকবে।'' ভগবানকে দর্শন করে আমার পিতা কেঁপে উঠে, তাঁকে বারবার প্রণাম জানাতে থাকেন। তারপর শ্রীনৃসিংহদেব অন্তর্ধ্যান করেন। আমার পিতা আমার কর্তৃপ(কে আনন্দের সঙ্গে জানালেন, ''আমার সন্তান এখানে থেকে তার সেবা সে চালিয়ে যেতে পারে।'' আমি আমার অন্যান্য আত্মীয়দের ফোন করে বলেছিলাম, এ বছর কোনও পরী(াতেই উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত নই।

আমায় সহায়তা ক(ন!

—দীপক গুপ্তা

দিল্লির দীপকগুপ্তা, মায়াপুরে এসে ভক্তি(শাস্ত্রী পাঠ্যত্র(মে যোগদান করেছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর হঠাৎ তিনি জল বসন্তে আত্র(ন্ত হন। তিনি অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং

আয়ুর্বেদিক, সমস্ত প্রকারের ডাক্ত(ারের নিকট তাঁর দ্রুত নিরাময়ের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁকে পরামর্শ দেন, ''আপাতত কুড়ি দিনের জন্য নির্জন স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ ক(ন।'' তিনি খুবই বিব্রত হয়ে ওঠেন, কেননা অনেক দিন থেকে তাঁর পিতা মাতাকে অনুরোধ করার পরই কেবল তিনি মায়াপুরে আসার অনুমোদন পেয়েছেন। এখন তাঁকে পাঠ্যত্র(ম থেকে বাদ পড়তে হবে আর সেই সঙ্গে তাঁকে জ্যেষ্ঠ শি(কদের আর সন্ন্যাসীদের সঙ্গ লাভ করা থেকেও বঞ্চিত হতে হবে।

তিন দিন ধরে ভীষণ কষ্ট পাওয়ার পর তিনি আর সহ্য করতে না পেরে, সোজা মন্দিরে চলে গেছেন। সন্ধ্যা আরতির ঠিক পরেই মন্দিরে গিয়ে শ্রীনৃসিংহদেবের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, '' হে ভগবান, দেখুন আমার কি দুরাবস্থা (তাঁর সারা শরীর ঘায়ে ভরা, সর্বাঙ্গে ব্যাথা আর যন্ত্রণা) অনুগ্রহ পূর্বক আমায় সহায়তা ক(ন।'' তারপর তিনি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার জন্য সারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে চমকে উঠে পূজারী একটু মহাপ্রসাদ দিয়েই নিরাপত্তা র(ীদের ডাকলে, সেই র(ী তাঁকে মন্দির থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বলল, তিনি যেন এইরূপ সংত্র(ামক ব্যাধি নিয়ে পুনরায় মন্দিরে না আসেন।

তাঁর ক(ফিরে, তাঁকে আরও সতেরদিন মতো এইভাবে কষ্ট পেতে হবে ভেবে দীপকবাবু হতাশ হয়ে পড়লেন।

সেদিন রাত্রি দু'টোর সময় সুস্থ মানুষের মতো দীপক বাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি শয্যাত্যাগ করে স্নান করে দেখলেন, তাঁর শরীরের সমস্ত ঘা আশ্চর্যজনক ভাবে সম্পূর্ণ সেরে গেছে, কোনও দাগও নেই। কোনরূপ ক্লান্তি বোধ না করে তিনি মন্দিরের প্রাতঃকালীন সমস্ত অনুষ্ঠানেই যোগদান করেন। দীপকবাবু বললেন, ''এই পবিত্র ধামে শ্রীনৃসিংহদেব যেভাবে সহায়তা করে আমার প্রাণ র(া করেছেন, তার জন্য আমি তাঁর নিকট সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমার সেই যন্ত্রণা ছিল অবর্ণনীয়, আর সে সব কিছুই তিনি সারিয়ে দিলেন মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।''

অণুরূপা দেবী দাসীর পত্র,

৩রা অক্টোবর, ২০০৬

হরে কৃষ(, আমার নাম অণুরূপা দেবী দাসী। আমি শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক ১৯৭৫-এ মিয়ামি ফ্লোরিডাতে দী(ত হয়েছি।

আমি হেপাটিটিস্-সি দ্বারা আত্র(ান্ত হওয়ার ফলে আমার যকৃতের অংশু অর্থাৎ তন্তুগুলি বর্ধিত হয়ে, তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ৪৮ সপ্তাহের জন্য আমার চিকিৎসা শু(

হয়েছিল, আর তাতে নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল মাত্র ৪৫ শতাংশ। তাতেও অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকবে।

২০০৪ সালে, ফ্লোরিডার আলাচুয়াস্থিত নবরমনরেতি মন্দিরে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের শুভাগমন হয়েছিল। মহারাজের নিকট গিয়ে, আমি যাতে ভালভাবে ইহজগৎ ত্যাগ করতে পারি, তার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। জয়পতাকা মহারাজ আমায় বললেন, ''এই দণ্ডখানা দেখছ, এটি মায়াপুরের নৃসিংহদেবকে স্পর্শ করেছে।'' তারপর তিনি আমার মস্তকে সেটি স্পর্শ করান। সেই রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে, আর তা আস্তে আস্তে নিরাময় হচ্ছে। পরের দিন সকালে ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি একটি ফোন কল পেলাম। ডাক্তাররা আমায় বললেন, ''অভিনন্দন গ্রহণ করুন, আপনি হেপাটাইটিস্-সি থেকে মুক্ত। মাত্র ৮ সপ্তাহে আপনার জীবাণুগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।'' চিকিৎসকরা চমৎকৃত কেননা আমার ছিল চরমতম মারাত্মক হেপাটিটিস্-সি।

চিকিৎসার প্রারম্ভেই আমি প্রতিদিন শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করতাম, ''আপনার যা ইচ্ছা, আপনি আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিতে পারেন, অথবা নিরাময় করতে পারেন, আপনি যেটি আমার জন্য ভাল মনে করেন, আমাকে দ্বিতীয় বার সুযোগ প্রদান করার জন্য, হে ভগবান,কৃতজ্ঞতা সহকারে আপনাকে ধন্যবাদ!

আপনাদের—
আগুরূপা দাসী।

সরকারী চিকিৎসক অনুপ্রাণিত

ডাঃ বাসুদেব দাস হচ্ছেন বাংলাদেশের একজন সরকারী চিকিৎসক। ২০০৬ সালে তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা পাঠরতা, ২০ বছর বয়স্কা কন্যা, মিষ্টি দাস খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার জরায়ুতে প্রাণঘাতী অর্বুদের জীবানু পাওয়া গিয়েছিল। তারা তাকে মুম্বাইতে এনে চিকিৎসা শুরু করেন। খুব সত্বর চিকিৎসকরা তাকে যে বাঁচাতে পারবেন সে আশা ত্যাগ করেন। ডাঃ দাস মুম্বাই-এর জুহুতে অবস্থিত ইস্কন মন্দিরে দর্শনে যান। ওখানে একজন ভক্ত মায়াপুরের আগামী নৃসিংহ চতুর্দশী উৎসবের একখানি প্রচার পত্র তাঁকে দেন। তিনি তারপর মায়াপুরে এসে ঐ উৎসবে যোগদান করেন। তিনি সেখানে সেই শ্রীনৃসিংহদেবের লীলা সম্বলিত একখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হন। পুস্তিকা খানিতে বর্ণিত শ্রীনৃসিংহদেবের অলৌকিকভাবে রোগ নিরাময়ের কয়েকটি ঘটনা পাঠ করে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাঁর কন্যাও সেরে উঠবে। তিনি বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে, মায়াপুরের নৃসিংহদেবের পূজারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে,

তাঁর কন্যার প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁকে নৃসিংহদেবের নিকট একটি বিশেষ পূজা অর্পণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

অতি সত্বর মিষ্টির স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে শুরু করে। বর্তমানে ধীরে ধরে সে তার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসছে।

বাসুদেব দাস তাতে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, শ্রীনৃসিংহদেবের লীলাপুস্তিকা নিজে মুদ্রণ করে বাংলাদেশে তা বিতরণ করেছেন। তিনি বললেন, ''আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত এবং পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য প্রত্যেকের উচিত শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করা।''

মায়াপুরে অলৌকিক ঘটনা

২০০৬-এর ২৮শে অক্টোবর রাধাকান্ত গোপাল দাস আর পদ্মরাধিকা দেবীদাসীর ১৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র, চক্রবর্তী রাজ, আতসবাজী ফাটাতে গিয়ে তার চোখ মুখ ভীষণ ভাবে পুড়ে গিয়েছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে দেখে বলেন, ওর মুখের পোড়া ঘাগুলি মধ্যম পর্যায়ের। তাঁরা পরামর্শ দেন ঃ (১) তৎক্ষণাৎ মুখে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হবে। (২) ১৫ দিন পর তার রাসায়নিক চিকিৎসা করা হবে। (৩) ৬ মাস বা এক বছর পরে ওর প্লাস্টিক সার্জারী করতে হবে, যাতে মুখের পোড়া দাগগুলো মিটে যায়।

পরবর্তী দু'দিন ধরে সে কোনরূপ নড়াচড়া না করে কেবলই শুয়ে ছিল, চোখ খুলতেও পারছিল না। তারপর তাকে ব্যারাকপুরের দিশা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, পরীক্ষা করে বোঝা গেল, চোখের ভেতরের সাদা অংশে ঘা হয়েছে কিন্তু মণিগুলো ঠিকই আছে। অতএব ওর দৃষ্টিশক্তির কোনও ক্ষতি হবে না। দিন পনের চিকিৎসা করলেই চোখ ঠিক হয়ে যাবে। পরের দিন তার পিতামাতা চক্রবর্তী রাজের দ্রুত নিরাময়ের জন্য পঙ্কজাঙিঘ্র প্রভুকে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট পূজো দিতে অনুরোধ জানান, আর পঙ্কজাঙিঘ্র প্রভু তা করেছিলেন।

২রা নভেম্বর পদ্মরাধিকা দেবীদাসী তাঁদের গুরুমহারাজ, জয়পতাকা স্বামীর নিকট এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। মহারাজ একটু রসিকতা করে তাঁর শিষ্যার কপালে একটু নৃসিংহদেবের প্রসাদি তৈল লাগিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি তার জন্য প্রার্থনা জানাবেন। সেই

সকালেই চত্র(কে তার মুখমণ্ডলের চিকিৎসার জন্য কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল বেলায় অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে মতামত জেনে, তাকে হাওড়ার রেলওয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন প্রবীণ চিকিৎসক তাকে পরী(া করে সুনিশ্চিত হন যে, তার দগ্ধ ঘাগুলি মধ্যম পর্যায়ের। তাই তার মুখের (তগুলিতে প্রাথমিক ভাবে ব্যান্ডেজ করার জন্য তাকে ড্রেসিং (মে নিয়ে যাওয়া হয়। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে ঐ ক(থেকে একজন কর্মী চিৎকার করে বেরিয়ে এসে, তার পিতামাতাকে ভেতরে নিয়ে যায়। ঐক(চত্র(বর্তীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওনারা হতবাক হয়ে গেছেন। এই চমৎকারিতায় তাঁরা ভীষণভাবে আশ্চর্য বোধ করেন। চত্র(ওখানে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছে, ওর মুখে পোড়া (তের বিন্দুমাত্রও চিহ(নেই! কি আশ্চর্য!!

ওখানে উপস্থিত চিকিৎসক সহ আর সবাইকে জিজ্ঞাসা করলে, তারা কেউই কোনও যুক্তি(দেখাতে পারলেন না। ওনাদের একজন বললেন, ''আপনারা আপনাদের মন্দিরে ফিরে গিয়ে ভগবানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।'' ইয়ে তো আপকা ভগবান কা চমৎকার হ্যায়'' (এটি আপনাদের০ ভগবানের অলৌকিক লীলা)।

শ্রীনৃসিংহদেবের জয় হোক! শ্রীশ্রী রাধামাধবের জয় হোক!!

লেখিকা ঃ শ্রীমায়াপুর ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শি(কা, পদ্মরাধিকা দেবীদাসী।

পরম ক(ণাময় শ্রীনৃসিংহদেব

প্রবীনা রোহিত, ল্যাস্টার, ইউ. কে.

শ্রীনৃসিংহদেবের বড় বড় ধারালো নখ, গর্জন মুখর ত্রু(দ্ধ মুখ দর্শন করে মনে হতে পারে যে তিনি বোধ হয় ভগবানের সর্বাপে(া ভয়ঙ্কর অবতার, কিন্তু ছ'বছরের বালক শ্যামের নিকট তিনি অত্যন্ত ভদ্র, পরম ক(ণাময় এবং পরম প্রেমময় ভগবান।

২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে শ্যামের দুটো পায়েই প্রচণ্ড ব্যাথা শু(হয়। সেই ব্যাথা এতটাই মারাত্মক রূপ ধারণ করল যে, দু'সপ্তাহের মধ্যে তাকে তিনবার হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হল। ডাক্ত(াররা রোগ নির্ণয় করে বললেন,—এটা হচ্ছে বৃহৎ অস্থিসন্ধি প্রদাহ, সন্ধিস্ফীতি বা প্রতিত্রি(য়াশীল গেঁটেবাত।

যতই দিন যেতে লাগল, শ্যামের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকল। সত্বর সে চলৎ-শক্তি(রহিত হয়ে পড়ল। সর্বত্রই ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। দিবারাত্রি সর্বদাই সেই তীব্র যন্ত্রণা তাকে পীড়া দিতে থাকল। ওর পা দু'টো সামান্যতম নড়াচড়া করলেও প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছে। চেয়ারে বসার মতো ওর পা দুটোকে বাঁকা করে রেখেই আমি ওকে এখানে-ওখানে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। সর্বদা তার পায়ের তলায় নরম বালিশ দিয়ে রাখতে হচ্ছিল।

ওষুধ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও, ছ'বছরের বালকের প(সেই যন্ত্রণা ছিল অসহনীয়। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ও প্রায়ই আমাকে অনুরোধ করতে থাকল, আমি যেন ওকে সাহায্য করি। তার আর্তনাদ ছিল হৃদয়-বিদারক। ও বার বার বলতে থাকল, ও যে কী ধরনের মারাত্মক যন্ত্রনা বোধ করছে, তা আমি বুঝতে পারছি না,—''ভগবান শ্রীকৃষ(কেবল তা বুঝতে পারছেন।''

ওর অসুস্থতা দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। ২০০৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী, সকাল বেলায়, পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন ঘটল। শ্যামের যন্ত্রণা আরও অসহনীয় হয়ে উঠল। ও যে কী যন্ত্রণা অনুভব করছিল, তা বর্ণনাতীত। এতটা যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় আমি ওকে কখনও দেখিনি। যন্ত্রণার উপশম করানোর জন্য ও আমাকে বার বার অনুনয়-বিনয় করতে থাকল, কিন্তু আমি তখন অসহায়। বালিশ দিয়ে ঘেরা বিছানায় ও তখন শুয়ে ছিল। আমি তার বিছানায় বসতে গেলেও, সামান্য নাড়া-চড়ায় যন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছে। আমি কোনও প্রকারে

ওষুধ দিয়ে তাকে বোঝালাম যে, ওষুধে সত্বর কাজ হবে, আর তাতে তার যন্ত্রণা কমবে। বহুভাবে তার মনোনিবেশকে অন্য কোনও দিকে পরিচালিত করার জন্য আমি চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে কোনই লাভ হল না। আমি এবং শ্যাম উভয়েই তৎক্ষণে বুঝে গেছি যে, ওষুধে কাজ হবে না– অতিসত্বর তা সত্যরূপে প্রমাণিত হল। প্রতি মুহূর্তে শ্যামের আর্তনাদ বেড়েই চলেছে, বড় অসহ্য। ও চিৎকার করে বলে উঠল, এ যন্ত্রণা সে আর সহ্য করতে পারছে না। ইতিমধ্যে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি ওকে বললাম, শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি মনোনিবেশ করতে।

শ্রীনৃসিংহদেবের কথা বলতেই, তা শ্যামের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। শ্যাম চিৎকার করে বলে উঠল,—"ঐ তেলটা নিয়ে এসো! সেই শ্রীনৃসিংহদেবের অভিষেক তেলটা! এখনই নিয়ে এসো!" আমি শ্যামের মুখের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, চোখের জলে ওর সারা মুখ ভিজে গেছে, আর তার চোখ দু'টো যেন ফুটে বেরিয়ে আসছে। ওর কণ্ঠস্বর তখন অত্যন্ত গম্ভীর এবং কম্পামান । ও তখন আমার কাছে তেল চাচ্ছে না, দাবী করছে—'এখনই'! শ্যামের মনে ছিল যে, কিছুদিন পূর্বে একজন মায়াপুরের ভক্ত আমাকে কিছুটা শ্রীনৃসিংহদেবের অভিষেক তেল দিয়েছিলেন, আর আমি সেটিকে আমার ঠাকুর ঘরে রেখেছিলাম।

আমি নিজেই তখন বিভ্রান্ত, তবুও ছুটে গিয়ে সেই তেলের বোতলটি এনে, ভীতিগ্রস্থভাবে ছিপি খুলতে খুলতে, শ্যাম আর আমি শ্রীনৃসিংহদেবের প্রার্থনা-মন্ত্র গাইতে থাকলাম। শ্যাম তখন কেঁদে কেঁদে গাচ্ছে। ওর কণ্ঠস্বর শুনে আমি বুঝতে পারছিলাম, ও কত যন্ত্রণা ভোগ করছে। ও তখন শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সহায়তার জন্য ক্রন্দন করছে। তার প্রার্থনা ছিল ভীষণ ঐকান্তিক এবং আর্তিপূর্ণ। শ্যাম তার প্রিয়তম শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট তখন সম্পূর্ণরূপে শরণাগত। সম্পূর্ণ প্রার্থনাটি ও জানতো না, কিন্তু আমার মনে হয় না যে, শ্রীনৃসিংহদেব তখন সেই প্রার্থনা যথাযথ হচ্ছে কি না, তা নিয়ে কোনও প্রকার বিচার-বিবেচনা করেছেন।

আমি বোতলটি খুলতেই, এক ফোঁটা তেল শ্যামের পায়ে পড়াতেই, ও হঠাৎ সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে মাথাটা এক পাশে হেলে পড়ল, দেখে মনে হল, ও সম্পূর্ণরূপে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। আমার মনে আছে,— আমি তখন শ্যামকে চোখ খুলতে বলে আকুলি- বিকুলি করে চিৎকার করছি। আমি ওকে নাড়াও দিচ্ছি। ওর কোন সাড়াশব্দ নেই। সেই অবস্থায় শ্যাম বোধ হয় ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশি থাকেনি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেই সময়টুকু ছিল অতি দীর্ঘ। আমার জীবনে কখনো এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিনি।

তারপর ধীরে ধীরে শ্যাম চোখ খুলল, তখন ওর মুখমণ্ডলে এক স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল মৃদু-হাস্য দেখে বোঝা গেল, ও তখন শান্ত– ত্রিশ সেকেণ্ড আগে যা ছিল, এখন তা সম্পূর্ণ বিপরীত। ও তখন মৃদু-স্বরে বলল,— "মা, আমি এখন ভাল আছি, আমাকে একটু নীচের তলায় নিয়ে যাবে?" আমি তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম! শ্যামের ঐকান্তিক প্রার্থনায় শ্রীনৃসিংহদেব তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন! গত কয়েক দিনের মধ্যে সেই প্রথম বার আমি ওকে যন্ত্রণায় কাতর না থাকা- অবস্থায় কোলে নিয়ে আলিঙ্গন করলাম। সে বারে শেষবারের মতো গেঁটেবাতের মারাত্মক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল শ্যাম। তারপর থেকে শ্যাম ক্রমশ সুস্থ-সবল হতে থাকল, আর অতি সত্বর সে আনন্দোচ্ছল, সুখী, আমুদে ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

সমস্ত ভক্তদের রক্ষক ও শ্রেষ্ঠ বীর, ভগাবন শ্রীনৃসিংহদেবকে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ জানাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— ইস্কন, শ্রীমায়াপুরের শ্রীনৃসিংহদেবের সঙ্গে কোনও ভক্তের যদি এই ধরনের কোনও আদান প্রদান হয়ে থাকে, তাঁরা যেন তা শ্রীপঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভুকে জানান, যাতে করে তাঁরা চাইলে আমরা পরবর্তীতে সেগুলি প্রকাশ করতে পারি।

শ্রীপঙ্কজাঙ্ঘ্রী দাস ব্রহ্মচারী

ইস্কন, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পিন ঃ ৭৪১৩১৩, পশ্চিমবঙ্গ

ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫০৩৩

ইমেল ঃ [illegible]